ক্রীতদাসের মত যাদের জীবন

জহুরী

ক্রীতদাসের মত যাদের জীবন

জহুরী

আল-হেরা প্রকাশনী

www.pathagar.com

ক্রীতদাসের মত যাদের জীবন

প্রকাশনায়
আল-হেরা প্রকাশনী
২/৩ প্যারীদাস রোড
ঢাকা-১১০০

মুদ্রণে
আশা কম্পিউটার এণ্ড প্রিন্টার্স
ঢাকা-১২১৭

প্রচ্ছদ
হামিদুল ইসলাম

প্রথম প্রকাশ
আগস্ট ১৯৯৫

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মূল্য ঃ ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা মাত্র

KRITODASHER MOTO JADER JIBON
BY: JAHURY
PUBLISHED BY: AL-HERA PROKASHANI
2/3 PARIDAS ROAD
DHAKA-1100

প্রাপ্তিস্থান

আশা বুক কর্ণার
১৯২, এলিফ্যান্ট রোড,
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

প্রফেসার্স বুক কর্ণার
১৯১, এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মদিনা পাবলিকেশন্স
৩৮/২,বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

প্রীতি প্রকাশন
৪৩৫/ক-এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ। সর্বশক্তিমান রাব্বুল আলামিনের রহমত ও বরকতের ওপর একান্ত নির্ভরশীল হয়ে জহুরী সাহেবের 'ক্রীতদাসের মত যাদের জীবন' পুস্তকখানা প্রকাশ করলাম। তাঁর পরবর্তী বই 'বটতলায় আর যেও না সখীরা' শীঘ্রই আপনাদের হাতে পৌছবে ইনশাআল্লাহ্।

'ক্রীতদাসের মত যাদের জীবন' পুস্তকের পাণ্ডুলিপি পাঠ করে আমি আনন্দিত হওয়ার পরিবর্তে ভীষণ ভাবে আহত হয়েছি। আহত হয়েছি এজন্য যে, মানুষের হাতে মানুষ কি এত লাঞ্ছনা পায়? অধীনস্তদের প্রতি ব্যবহারে মানুষ কি এত নির্মম হতে পারে? ন্যুনতম মানবিক আচরণই কি তারা পেতে পারেনা? প্রত্যেকটি ঘটনা পাঠ করে শিউরে ওঠেছি। তাই সিদ্ধান্ত নিলাম, এসব ঘটনা পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়ে সমাজের প্রত্যেক স্তরের মানুষের কাছে এবং বিশেষ করে প্রতিটি পরিবারের গৃহিনীর কাছে পৌছা উচিত। এ লক্ষ্যেই অর্থাৎ একমাত্র মানবিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই পুস্তকখানা প্রকাশ করলাম।

পাঠক পাঠিকা ভাই বোনেরা এই পুস্তক পাঠ করে ভিন্ন একটা স্বাদ পাবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। আমাদের জানা মতে বাজারে বাংলা ভাষায় এ বিষয়ের ওপর আর কোন পুস্তক নেই।

আল্লাহর রহমত এবং আপনাদের দোয়াই আমাদের একান্ত কাম্য।

ফারুক আহমদ

www.pathagar.com

আভাষ

'ক্রীতদাসের মত যাদের জীবন' পুস্তকখানা তাদের নিয়ে লিখেছি, যারা আমার এ বই কখনও পড়বেনা, দেখবেনা এবং এর খোঁজখবরও জানবেনা। কারণ, তারা লেখাপড়া জানেনা, তারা ক্রীতদাসের মত জীবন যাপন করে। কেউ যদি তাদের বলেও থাকে যে, এই দেখ তোমাদের নিয়ে লেখা এ বই, তাহলেও তারা বইটি হাতে নেবেনা। কারণ, তাদের হাতে বই, সে তো এক বিস্ময়কর ব্যাপার। এই পুস্তক যাদের নিয়ে লেখা, তাদের পদবী বইয়ের ভাষায় 'গৃহ–পরিচারিকা ও গৃহ–পরিচারক', বড়লোকদের আটপৌরে ভাষায় যাদের নাম 'চাকর–চাকরানী,' নবাবী আমলের অন্দর মহলীয় ভাষায় বা জমিদারী জমানার জমিদারী জবানে যাদের নাম 'বান্দাহ –বান্দী, দাস–দাসী' প্রাচীন আমলে যাদের পরিচিতি ছিল গোলাম, স্লেভ, ক্রীতদাস আর দাসী। আমি অবশ্য প্রাচীন কালের বা মধ্যযুগের এমনকি আধুনিক যুগের এই দশকের আগের গৃহপরিচারিকা বা পরিচারকের জীবন নিয়ে সাধারণতঃ এ পুস্তকে আলোচনা করিনি, আলোচনা করেছি শুধু ১৯৯০ সাল থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের, বিশেষ করে এই রাজধানী ঢাকার মাত্র ৫৯ জন গৃহপরিচারিকা ও পরিচারক নিয়ে, যারা ক্রীতদাসের মত জীবন যাপন করেছে। কেউ কেউ পঙ্গু হয়েছে, নির্মম অত্যাচারের ক্ষত–চিহ্ন অংগে বহন করে এখনও বেঁচে আছে, অত্যাচারের ধকল সামলাতে না পেরে অনেকে মারাও গেছে, তাদেরই দুঃখময় জীবনের খন্ড ঘটনা নিয়ে এই পুস্তক রচিত। বাণিজ্যিক দিক থেকে চিন্তা করলে এই লেখা একটা ক্ষতি ছাড়া আর কিছু নয়, তবুও আমি তাদের ভালবেসে বইখানা লিখেছি। আর্থিক দিক থেকে লাভবান না হলেও আমি আত্মিক সান্ত্বনা ও মানবিক প্রশান্তি প্রচুর লাভ করেছি এই পুস্তক রচনা করে।

যে সব বেগম সাহেবা চাকর–চাকরানীদের ক্রীতদাস আর দাসী মনে করেন না বরং মানুষ জ্ঞান করেন, মায়া মমতা দিয়ে লালন করেন, মানবিক কারণে তাদের প্রতি সুবিচার করেন, তাঁরা আমার বইকে ভালবাসবেন এবং আমার বক্তব্য সমর্থন করবেন, কিন্তু যে সব বেগম সাহেবা ফুলন মেজাজী, দাম্ভালনী, সদ্য হয়েছেন অভিজাত, আর টাকার গরমে সব সময় থাকেন হিটেড, বউ না হয়ে যারা নায়িকার মত জীবন যাপন করেন, তারা আমার বইকে তো ভালবাসবেনইনা বরং আমার উদ্দেশ্যে লিপষ্টিক–রংগীন ঠোঁট নাড়বেন এবং নানা বকবকা করবেন নিশ্চিত।

আমার স্ত্রী পত্র–পত্রিকায় চাকর–চাকরানীদের সচিত্র করুণ কাহিনী পড়ে রীতমত শিহরিত হন। তাদের নিয়ে একখানা বই লেখার তাগাদা তিনি আমাকে প্রায়ই করেন। সুতরাং বলা যায়, তারই তাগাদার ফসল 'ক্রীতদাসের মত যাদের জীবন' পুস্তকখানা। তার তাগাদার সংগে আমার মন মানসিকতা এক হয়ে যাওয়ার কারণেই আমাকে এই পরিশ্রম করতে হলো। রহমানের মা (রহি) আর সাজুর মা, এই দু'জন গৃহ–পরিচারিকার প্রতি আমার স্ত্রীকে যে মানবিক আচরণ করতে দেখে আসছি, তা আমাকে এই পুস্তক রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। রহমানের মা আমার বাসায় ছিল আঠার বছর। সে আমার ছেলে মেয়ের খালাম্মা, আর সাজুর মা আছে দশ বছর ধরে আপন জন হয়ে।

যাদের সাহায্য সহযোগিতা এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে এই বইখানি লেখা ও প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে, তারা হলেন জনাব মুস্তাফিজুর রহমান, জনাব আব্দুল ওয়াহেদ খান, জনাব আব্দুল আউয়াল (আশা কম্পিউটারের মালিক), জনাব মিজানুর রহমান (স্বপন) (আশা কম্পিউটারের অপারেটর)।

আমার এই পুস্তক পাঠ করে যদি ফুলন–মজাজী একজন বেগম সাহেবাও মানবিকতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন, তাহলে আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে আমি মনে করব। আল্লাহ যেন পুস্তকটি কবুল করে নেন, তাঁর কাছে আমার এ মোনাজাত।

সালেহ উদ্দীন আহমাদ (জহুরী)

স্থায়ী ঠিকানা ঃ
গ্রাম ও ডাকঘর ঃ কদমরসুল
থানা ঃ গোলাপগঞ্জ
জেলা ঃ সিলেট

বর্তমান ঠিকানা
১/১০ মীরবাগ,
ঢাকা–১২১৭

www.pathagar.com

আমার সহধর্মিণী
মোসাম্মাৎ খালেদা খানম— এর হাতে
এই পুস্তকখানা তুলে দিলাম

www.pathagar.com

লেখকের প্রকাশিত বই

১। অপসংস্কৃতির বিভীষিকা (তৃতীয় মুদ্রণ)

২। ধূম্রজালে মৌলবাদ

৩। খবরের খবর (১ম খন্ড)

৪। প্রেষ্টিজ কন্‌সার্ণড (তৃতীয় মুদ্রণ)

৫। তিরিশ লাখের তেলেসমাত (দ্বিতীয় মুদ্রণ)

৬। জহুরীর জাম্বিল পহেলা বালাম (দ্বিতীয় মুদ্রণ)

৭। জহুরীর জাম্বিল দোসরা বালাম

৮। মস্তানদের জবানবন্দী

৯। ক্রীতদাসের মত যাদের জীবন

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

১। স্বজন যখন দুশমন হয়

২। জহুরীর জাম্বিল (তেসরা বালাম)

www.pathagar.com

সূচী

ক্রীতদাসের মত যাদের জীবন ৮
মুর্শেদারা স্রোতে ভাসা শেওলা ১৮
নাসিমার পিঠে আমাদের সমাজ-চিত্র ২১
হাফিজা হারিয়ে গেল চিরতরে ২৬
শিল্পী নামের মেয়েটি ৩১
আছিয়াদের জীবন যেন ঝড়ের ছোবল ৩৫
শাহিনারা শুধু কাঁদতেই জন্ম নেয় ৩৭
রফিকের পিঠে আধুনিক বর্বরতার সীলমহর ৩৯
শেফালী ঝরে পড়ে গেল ৪১
কবর থেকে হোসনেআরার প্রত্যাবর্তন ৪৪
মনিবের বাসায় মুনীরের বন্দীজীবন ৪৬
তলপেটে প্রচন্ড লাথিতে ফিরোজা মরলো ৪৮
আধুনিক বর্বরতার শিকার কিশোরী মনি ৫০
আয়েশার অপরাধঃ হ্যানির গোপন ব্যাপার জানে ৫৩
চম্পা বিচার পেলো মরণের পর ৫৫
সীমার চিৎকারকে তলিয়ে দেয়া হতো মিউজিক ক্যাসেট বাজিয়ে ৫৭
দুঃসংবাদ কণিকা - ১৯৯০ ..... ৫৯
দুঃসংবাদ কণিকা - ১৯৯১ ..... ৬৪
দুঃসংবাদ কণিকা - ১৯৯২ ..... ৭০
দুঃসংবাদ কণিকা- ১৯৯৩ ..... ৭৫
মুর্শেদা থেকে লাকি ৮০
মানবাধিকার কমিশনের জরিপ ৮৮
তাদের কথাই বলা হয়েছে ৯০
তাদের কথা আছে পাক কালামে ৯২
তাদের কথা আছে নবী (সাঃ) এর জীবনাদর্শে ৯৪

www.pathagar.com

ক্রীতদাসের মত যাদের জীবন

বুঝেছি সত্য, চির—দাসত্ব, কত বেদনাময়,
মানুষের হাতে মানুষ কতই না লাঞ্ছনা সয় ।

দাসত্বের কি যে অসহনীয় জ্বালা, তা শেখ সাদীর মত মহাকবিও মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন। তাই তিনি নিজের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে এই পংতিদ্বয় রচনা করে গেছেন। সেকালের দাস-প্রথা আর দাস-দাসীদের বেদনাময় জীবন-জ্বালা নিয়ে এ আলোচনা নয়, তাই সেকালের এই শ্রেণীর মানব-মানবীর মানবেতর দুঃখ-ভরা জীবনের বিচিত্র জীবনকথা বর্তমানের আলোচনা থেকে বাদ রেখে একালের 'দাস-দাসীদের' কথা আলোচনা করছি।

কেউ কেউ হয়তো প্রশ্ন রাখবেন, একালে অর্থাৎ এই যুগে কি দাস প্রথা আছে? এ প্রশ্নের উত্তরে আমি দৃঢ় প্রত্যয়ের সংগে বলছি, জ্বী হ্যাঁ, দাস প্রথা আছে অত্যন্ত মজবুত ভাবে, আর তা আছে আধুনিক টেকনিকে, আধুনিক লেবাসে, যদিও আগের চেহারা সুরতে আর টেকনিকে ও লেবাসে নেই।

বর্তমান বিশ্বের উন্নত, উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশে তথা গোটা বিশ্বে মানবাধিকারের জন্য ভীষণ হৈ চৈ করা হয়। এই হৈ চৈ দেখে আমার হাসি পায়। হাসি পায় এ জন্য যে, প্রত্যেক দেশেই রয়েছে মানুষে মানুষে মৌলিক অধিকার ভোগ আর বঞ্চনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ। এক শ্রেণীর লোক অন্য শ্রেণীর মানুষের অধিকার লংঘন করছে নিরন্তর। কৃত্রিম সামাজিক বিন্যাসে তৈরী সর্বনিম্ন শ্রেণীর মানুষ কিন্তু কারও কোন অধিকার লংঘন করেনা, করতে পারে না, সে শক্তিও তাদের নেই। তাই মানবাধিকার লংঘনের বহুমুখী বিচিত্র অনুশীলন সর্বনিম্ন শ্রেণীর ওপর দিয়েই সাধারণত চলে। এই শ্রেণীর মানুষ হতে পারে কল কারখানার বা খেত খামারের শ্রমিক, বাস্তহারা এবং নিরন্ন আবাসহীন ভবঘুরেও, বাসার চাকর চাকরানীও এই শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত। বাসার চাকর-চাকরানীরা যে মানব জাতিরও অন্তর্ভুক্ত, সুখ দুঃখের অনুভূতি যে তাদেরও আছে, চিত্তবিনোদন একটুখানি হলেও যে তাদের দরকার, আর মুক্ত পরিবেশে নিঃশ্বাস নেয়ার প্রয়োজন যে তাদেরও আছে, তা অনেকে স্বীকারই করেন না। মানবাধিকার লংঘনের ষ্টীম-রোলার আধুনিক যুগের এই শ্রেণীর ওপর

www.pathagar.com

দিয়ে অনেকে চালিয়ে থাকেন। চাকর চাকরানী হিসাবে বাসায় বাসায় যে সব ছেলে মেয়ে বা যৌবনোত্তর বয়সের নারী পুরুষ কাজ করে, তাদের অনেকেই ক্রীতদাস আর দাসীর মত জীবন যাপন করে বা করতে বাধ্য হয়। বাংলাদেশের শহরে বন্দরে এ জঘণ্য ক্রীতদাস প্রথা বিদ্যমান আছে বিভিন্ন রূপে, বিভিন্ন নামে, বিভিন্ন প্রকৃতি ও আকৃতিতে।

সেকালের জমিদারী প্রথা অথবা সুদখোর মহাজনদের শোষণের কথাই ধরা যাক। আমরা জানি, দেশে এখন জমিদারী প্রথা নেই এবং সুদখোর মহাজনদের সেই ভয়ংকর দৌরাত্মও নেই। এই যে তথ্য আমরা জানি, এই 'জানা' কি সঠিক?

মোটেই সঠিক নয়। কেউ কি বলতে পারবেন যে, আমাদের সমাজে কোন না কোন চেহারা-ছুরতে, মুখে আর মুখোশে, রং বদল করে বিভিন্ন নামে নব্য জমিদার ও নব্য সুদখোর মহাজন ও মহাজনী সংস্থা তৎপর নেই? যদি বলেন হাঁ, তৎপর আছে, তাহলে এ সত্যকেও স্বীকার করতে হবে যে, দাস প্রথাও সমাজে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে না থাকলেও বিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যমান আছে। বলা বাহুল্য, কোন কোন বাসার চাকর চাকরানীর জীবন ক্রীতদাসের মতই কাটে। আমি এই পুস্তকে তাদেরই ৫৯ জনের দুঃখময় জীবনের খন্ড কাহিনী তুলে ধরেছি।

সমাজের অন্যান্য সন্তানের মা বাবার মত ওদের মা বাবাও আশা করেছিলেন, সন্তানেরা বড় হবে, মানুষ হবে, লেখাপড়া করবে, রুজি রোজগার করে মা বাবার সংসারে আর্থিক সচ্ছলতা আনবে; কিন্তু তাদের সে আশা পূরণ হয়নি নানা কারণে। ফলে, তাদের সন্তানদের শিশু বয়সে বা কিশোর বা যুবক বয়সে গৃহ-ভৃত্যের চাকরী নিতে হয়েছে।

বাসার চাকর চাকরানীরা নামহীন নয়। প্রত্যেকেরই নাম আছে। যে সব বাসায় ওরা কাজ করে, অল্প বয়সী হলে তাদের নাম ধরে ডাকা হয়, কিন্তু পেশা-পরিচিতির নাম 'চাকর' বা 'চাকরানী'। চাকরানীদের মধ্যে যারা বিবাহিতা, তাদের নাম ধরে সাধারণত কেউ ডাকেন্ না। তারা হয়ে যায় সকলের বুয়া। 'বুয়া' শব্দটি বোনের সমার্থক শব্দ, কিন্তু তাদের বুয়া বলে ডাকেন বাসার বিভিন্ন সম্পর্কের প্রত্যেকে। এদেশে পঞ্চাশ বা ঘাটের দশকে যত ছায়াছবি নির্মিত হয়, সে সব ছবিতে যারা চাকরের ভূমিকায় অভিনয় করতো, তাদের নাম 'আব্দুল' থাকতো। 'আব্দুল' আরবী শব্দ, যার অর্থ গোলাম।

চাকর চাকরানীর পেশা-পরিচিতির সম্বোধন কিন্তু হরেক রকম। বাসার সদস্যদের পারিবারিক ভাষা যেমন, চাকর চাকরানীদের পেশা-পরিচিতিমূলক সম্বোধনও তেমন। যেমন কাজের ছেরা, কাজের ছেরী, কাজের ছেমরা বা ছেমরী, কাজের লোক, কাজের ছেলে বা মেয়ে, মাতারী, বাসার ঝি, বুয়া ইত্যাদি।

তারা বাসায় 'চাকরী' করে, একথা কি আমরা মেনে নিতে পারি? না, পারি না। কারণ, তাদের কাজ কিন্তু চাকরীর সংজ্ঞায় পড়ে না। উড়বার মত পাখা থাকলেই যে কোন প্রাণীকে আমরা পাখি বলি না। কারণ, পাখা থাকার সাথে সাথে আরও কিছু বৈশিষ্ট্য থাকতে হয়। তা না থাকলে পাখা থাকা সত্ত্বেও পাখি বলা যায় না। অনুরূপভাবে বাসার চাকর চাকরানীদের

www.pathagar.com

বাসার কাজকেও 'চাকরী' বলা যায় না, যদিও কাজের বিনিময়ে তারাও মাসে মাসে কিছু পায় বটে। ধরুন, আপনি অফিসে কাজ করেন, ফুলমতির মা অর্থাৎ বুয়া বাসায় কাজ করে। মাস শেষে আপনি মাহিনা পান, বুয়াও পায়। মিল এ পর্যন্তই, আর সবই অমিল। দোয়েল একটি পাখি, তার ডানা আছে, সে উড়ে। মশারও পাখা আছে, সেও উড়ে, কিন্তু মশা অবশ্যই পাখি নয়। মশাকে কেউ পাখি বলেনা।

'চাকরী' শব্দের আভিধানিক অর্থ সর্বক্ষেত্রে মানা যায় না। চাকরীর ক্ষেত্রে সাধারণত একটা নিয়োগপত্র লাগে। যিনি যে চাকরীই করুন না কেন, তিনি একখানা নিয়োগপত্র পান। অবশ্য নিয়োগ পত্র পাওয়ার আগে চাকরীর জন্য প্রার্থী হয়ে আবেদন করতে হয়, কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন বোধ করলে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা নেন। পরীক্ষায় পাস করলে নিয়োগপত্র ইস্যু করা হয়। চাকরীর কতকগুলো নিয়ম বিধি আছে, তা মানার অঙ্গীকার করতে হয়, মানতে হয়। যথাসময়ে কর্মস্থলে নিয়মিত উপস্থিত হতে হয়, অফিস বিধি মেনে কাজ করতে হয়, ছুটির ঘন্টা বাজলে কর্মস্থল ত্যাগ করতে হয়।

চাকরীর পদ, মান, ধরন যাই থাকনা কেন, অসুস্থতার জন্য ছুটি আছে, মেয়াদ শেষে পেনশন আছে, পে স্কেল আছে, নৈমিত্তিক ও অর্জিত ছুটি আছে, প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্রাচুয়িটি আছে, কর্তৃপক্ষ অন্যায় করলে ইউনিয়ন তা দেখে। চাকরীর কর্মঘন্টা নির্দ্ধারিত আছে। অফিসের বড়কর্তাও চাকর আর অফিসের সুইপারও চাকর। সবাই চাকর, চাকরের নীচে চাকর, তার নীচেও চাকর, সিঁড়ির পর সিঁড়ি। কিন্তু প্রত্যেকেই চাকরী–নীতিমালার অধীন। যেমন স্যারের উপরে আছেন স্যার, তাঁর উপরেও আছেন স্যার।

চাকরীর এই নীতিমালার বা বিধি বিধানের সংগে বাসার চাকর চাকরানীর চাকরীকে তুলনা করা যায় না। চাকরী নামক পর্বতের শৃঙ্গে যিনি আছেন, ধরা যাক, তিনি প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী, তিনি কি পারবেন পাদদেশে দন্ডায়মান আব্দুল বা বুয়ার সংগে হাত মিলাতে? না, পারবেন না। রাজনৈতিক মতলবে লোক দেখানোর জন্য যদি হাতও মিলিয়ে থাকেন, তাহলে হাতকে পরে স্যাভলন দ্বারা হয়তো ওয়াশ করবেন।

✪ বাসায় যারা কাজ করে, তারা কি নিয়োগপত্র পায়?

✱ না, লিখিত নিয়োগপত্র পায় না, তবে মৌখিক ভাবে নিয়োগ পায়।

✪ তাদের কি ইন্টারভিউর সম্মুখীন হতে হয়?

✱ অবশ্য হতে হয়। কঠিন ইন্টারভিউয়ের সম্মুখীন হতে হয়, জেরা করে তাদের জর্জরিত করা হয়।

✪ বাসার কাজের কি কোন নিয়ম আছে, যা মান্য করার জন্য অংগীকার করতে হয়?

✱ হাঁ, নিয়ম বিধি আছে, তা বেগম সাহেবা মুখে মুখে বলে দেন আর নিয়োগপ্রাপ্ত চাকর জ্বী জ্বী বলে স্বীকার করে নেয়।

✪ বাসার কাজের কি কর্মঘন্টা বাধা আছে?

www.pathagar.com

✱ জ্বী হাঁ, তাও আছে। যেমন সকলের আগে ঘুম থেকে উঠতে হবে এবং সকলে ঘুমাতে যাওয়ার পর চাকর-চাকরানীদের ঘুমাতে যেতে হবে।

✪ অফিস ডিসিপ্লিন অফিসে আছে, বাসায় কি তেমন ডিসিপ্লিন আছে?

✱ হাঁ, তাও আছে। এই ডিসিপ্লিন হচ্ছে এই, বাসার চাকরকে বাসার যে কোন বয়সের সদস্য, শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত, যে কেউ গালি দিক, বকাঝকা করুক, প্রহার করুক, চাকরকে কিন্তু প্রতিবাদ করা চলবে না। কিলের চোটে জীবন যদি যায়, তাও যাক, কিন্তু আনুগত্যের ব্যত্যয় ঘটানো যাবে না, প্রাণটা চিরতরে চলে যেতে চাইলে যেতে দিতে হবে আনুগত্যের নিঃশব্দ পথ ধরে। এই হলো ডিসিপ্লিন।

✪ অফিসের একজন সুইপারকে বড় সাহেব একটা থাপ্পড় দিলে ইউনিয়ন বড় সাহেবকে ছেড়ে দেবে না, কিন্তু বাসা চাকর প্রহারে জর্জরিত হলে কেউ কি প্রতিবাদ করতে এগিয়ে আসে?

✱ না, এমন কি চির বিদায় গ্রহণ করলেও কেউ এগিয়ে আসে না।

✪ চাকুরী বিধিতে পে-স্কেল আছে, গ্রেড আছে, বাসা চাকুরীতে কি তাই আছে?

✱ না, এসবের কোন বালাই নেই।

✪ চাকুরী যারা করে, তাদের নানা ধরনের ছুটি আছে; বাসায় যারা কাজ করে, তাদের কি কোন ছুটি আছে?

✱ না, তাও নেই। তবে ফ্রি আহার আছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে উচ্ছিষ্ট। আহার থাকলেও বিহার নেই।

✪ তারা কি উৎসব বোনাস পায়?

✱ না, তা সাধারণত পায় না। তবে কেউ কেউ একটা লুঙ্গি ও সার্ট বা একখানা নিম্ন মূল্যের ও মানের শাড়ী পেয়ে যায়।

✪ বাসা চাকরদের প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্রাচুয়িটি কি আছে?

✱ তওবা তওবা, প্রশ্নই উঠে না।

✪ বাসস্থান সমস্যার কি ব্যবস্থা আছে?

✱ হাঁ, এ ব্যবস্থা আছে, সাধারণত বারান্দায় বা সিঁড়ি ঘরে।

এবার বলুন, তাদের এই জীবনকে কি 'চাকরীর জীবন' বলবেন? চাকরীর কোন নীতিমালায় কি তাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম পড়ে? না, তারা চাকুরীর নীতিমালার অন্তর্ভূক্ত নয়। ১৬ থেকে ২০ ঘন্টা পর্যন্ত তাদের কাজ করতে হয়। বোনাস নেই, বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট নেই, প্রভিডেন্ট ফান্ড নেই, গ্রাচুয়িটি নেই, সাধারণ ছুটি নেই, এমনকি সাপ্তাহিক ছুটিও নেই। জিজ্ঞাসা করি, এটা কি ধরনের চাকরী?

www.pathagar.com

আমি বলি ওরা চাকর নয়, ওরা দাস বা দাসী। চাকর আর দাসের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান। চাকর প্রতিদিন ছয় বা আট ঘন্টা চাকরী করে। অতিরিক্ত কাজ করলে পায় ওভার টাইমের পারিশ্রমিক। যতক্ষণ কাজ করে ততক্ষণ থাকে কর্তার অধীন, কিন্তু বাকি সময় সে স্বাধীন। তার ছুটি আছে, ভবিষ্যত আছে, কাজের মধ্যেও স্বাধীনতা আছে, অভিযোগ পেশ করার অধিকার আছে ও জায়গা আছে, চাকরী ছেড়ে দেয়ার এখতিয়ারও আছে, কিন্তু আমি যাদের দাস বা দাসী বলছি, তারা এসব সুযোগের একটিও ভোগ করতে পারে না।

আমার এ আলোচনা তাদের নিয়েও নয়, যারা বাসায় পার্ট টাইম কাজ করে, নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কাজ শেষ করে চলে যায়। মাস শেষে মাহিনা পায়। এদের আর এক নাম 'কাজের ছুটা লোক'।

আমি তাদের কথা বলছি, যারা ফুল টাইম বাসায় কাজ করে, যাদের 'কাজের বান্ধা লোক' বলা হয়ে থাকে। প্রবেশের পর বের হওয়ার পথ এদের অনেকের জন্যই চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। তাদের কে কোথায় কোন্ কোন্ বাসায় কিভাবে আছে, তা জানার উপায় নেই। মরহুম ফজলে লোহানীর পরিচালনায় 'যদি কিছু মনে না করেন' ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানের বদৌলতে বালাখানায় বন্দি ও বন্দিনী দু'চার জনের কশাঘাত-জর্জরিত দেহ টেলিভিশনের পর্দায় দেখা যেত। 'আইন আদালত' অনুষ্ঠানেও কখনো কখনো বহু কষ্টে বিজ্ঞ উপস্থাপক দু'একটি কাহিনী হাজির করতেন জর্জরিত-দেহ সহ। 'দৃষ্টিকোন' অনুষ্ঠানেও দু'একজনের কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে, এখন তাও আর দেখা যায় না। পত্র পত্রিকায় অবশ্য নির্যাতনের দু'একটি কাহিনী আজকাল প্রকাশিত হতে দেখা যাচ্ছে। এভাবে বিচ্ছিন্নভাবে দৈহিক নির্যাতনের দু'চারটি কাহিনী জনসাধারণ জানতে পারছেন। আমার মতে হাজারে হয়তো দু'চারটা ঘটনা আমরা জানি। বাকি গুলো আমরা জানি না এবং জানার সুযোগও নেই। ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎকার নিতে গেলে এরা মন খুলে কথা বলে না। কারণ, জানাজানি হয়ে গেলে সাহেব বিবি তাদের আস্ত রাখবেন না। এই ভয়ে তাদের মনের কথা সহজে উদ্ধার করা যায় না। বিভিন্ন পরিবারে তারা কিভাবে আছে, এসব কারণেই সঠিক খবর জানা যায় না।

একবার রাজধানীর এক অভিজাত কলোনী মাঠে বাসা চাকরদের এক মজমা দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এই মজমায় আমি প্রায় এক ঘন্টা কাটাই। তাদের জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী শুনার সুযোগ ঘটে। কাহিনীর কোন কোনটি হৃদয়বিদারক, কোন কোনটি হাস্য-রসাত্মক, কোন কোনটি বিশ্রী ও অশ্লীল, আবার কোন কোন কাহিনী শুনে মনে শান্তিও পাই। তাদের কাহিনী শুনার জন্য অবশ্য আমি এমন মজমা অনুসন্ধান করিনি। আমি গিয়েছিলাম একটি ছেলের কাছে। সে ছেলে ঐ অভিজাত কলোনীর কোন এক বাসায় কাজ করতো। বিদেশ থেকে তার এক আত্মীয় কিছু কাপড় তার এবং তার মার জন্য পাঠিয়েছিলেন। সেটা বহন করে নিয়ে আসেন আমার এক বন্ধু। তিনি ছেলেটির ঠিকানা আর কাপড়ের পোটলা আমার কাছে দিয়ে দেশের বাড়ীর চলে যান। এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম। ছেলেটি যে কলোনীতে থাকতো, সে কলোনীর মাঠের এক কোণে দেখলাম ১০/১২ জন তরুণ বসে আছে। ভাবলাম, ছেলেটির ঠিকানা তাদের

www.pathagar.com

কাছে জিজ্ঞাসা করেই দেখি। বাসার নম্বর এবং ছেলেটির নাম উচ্চারণ করতেই ১৩/১৪ বছরের একটি ছেলে বললো, আমিই নূরুল ইসলাম।

এত তাড়াতাড়ি ছেলেটির সংগে দেখা হবে, তা আশাও করিনি। খুশী হলাম। তাকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে যখন নিশ্চিত হলাম যে, সে-ই নূরুল ইসলাম, তখন কাপড়ের পোটলাটা তার হাতে দিতে গিয়ে দিতে পারলাম না। ছেলেটি বললো, আপনার বাসায় এটা থাক। আপনার বাসার ঠিকানা আমাকে দিন। আমি ছুটিতে বাড়ী যাওয়ার সময় আপনার বাসা থেকে নিয়ে যাব। এখন এই কাপড় বাসায় নিয়ে গেলে আমাকে সন্দেহ করবে। ছেলেটি আমাকে এই অসুবিধার কথা বুঝিয়ে বললো, উপস্থিত সকলে তার কথাকে সমর্থন করলো। তাই আমি তাকে কাপড়ের পোটলাটা গ্রহণ করার জন্য পুনরায় চাপ দেইনি। ছেলেটি আমাকে কিছু আপ্যায়ন করাতে চায়, কিন্তু কিভাবে করাবে, সে ভেবে পাচ্ছিল না। সাহেবের বাসায় নিয়ে যাওয়ার সাহস তার নেই, আর আশে পাশে চায়ের দোকানও নেই। তার এই অসহায় অবস্থা দেখে তাকে বারণ করলাম এবং আমিও ঘাসের উপর বসে পড়লাম। তারপর একে একে সবাই নিজের পরিচয় দিল। পরিচয়ে এ তথ্য উদঘাটিত হলো যে, সবাই বাসায় কাজ করে অর্থাৎ সবাই গৃহ-ভৃত্য। মাঠে সবাই এখন একত্রে কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে তারা বললো, বাসায় সবাই এখন ঘুমাচ্ছে। এই সময়টাতে তাদের অবসর। এ সুযোগে তারা একত্রে বসে, একে অন্যে দেখা সাক্ষাৎ হয়, আলাপ আলোচনা চলে, সুখ দুঃখের কাহিনী পরস্পরে বয়ান করে বুকটা হালকা করে।

আমি এ সুযোগটা মোটেই ছাড়লাম না। তাদের স্ব-স্ব-অভিজ্ঞতা জানার জন্য প্রত্যেককে আলাদা আলাদাভাবে নানা কথা জিজ্ঞেস করলাম। সে এক দীর্ঘ ও বিচিত্র কাহিনী।

একজন বললো, কি বলবো স্যার, আমি যে বাসায় থাকি, সে বাসায় চারজন কাজের মানুষ। চারজনের মধ্যে একটি মেয়ে, একজন মাতারী আর আমরা দু'জন পুরুষ। সাহেব, বেগম সাহেবা আর তাদের ছেলেমেয়ে নিয়ে মোট পাঁচজন। তাদের জন্য যা রান্না হয়, এর কোন অংশ আমাদের ভাগে ভুলেও আসে না। আমাদের জন্য রান্না ভিন্ন। আমাদের বাজারও ভিন্ন, যদিও বাজার করা হয় একত্রে। আমাদের জন্য কাঁচা বাজার ও চাউল আলাদা করে প্রতিদিন দেয়া হয়। সে চাউল ইরি অথবা বোরো। সাহেবরা সুবাসযুক্ত যে চাউল খান, সে চাউলের সুবাসই আমরা পাই, কিন্তু স্বাদ পরখ করতে পারি না। আমাদের খাওয়া দাওয়ার মান বেগম সাহেবার নির্ধারিত মানের উপরে উঠছে কিনা, তা পরীক্ষা করার জন্য বেগম সাহেবা দুবেলা চেক করে দেখেন। সকাল বেলা ঠান্ডা ভাত আর বাসী তরকারী যদি থাকে, তা দিয়ে সকালের নাস্তা করি, তরকারী না থাকলে পিঁয়াজ আর কাঁচা মরিচ দিয়ে পান্তা ভাত গিলি।

অন্য একজন বললো, আমাদের বাসায় তিন ধরনের ভাত তরকারী রান্না হয়। আমাদের জন্য এক রকমের, ড্রাইভার, দারোয়ান আর সাহেবের দুই ভাতিজার জন্য মধ্যম ধরনের আর সাহেবদের জন্য তো কি হয় তা বুঝতেই পারেন।

www.pathagar.com

উঠতি বয়সের এক ছেলে বললো, আমাদের বাসায় এসব কারবার নেই, সাহেব যা খান, তাই আমাকে খেতে দেন, কিন্তু সাহেবের কঠিন বাতের রোগ, পা আর কোমর টিপতে টিপতে আমার হাতের অবস্থা থাকে না। এই দেখুন আমার আঙ্গুলের অবস্থা। একথা বলে সে তার নিজের আংগুল দেখালো।

আর একজন বললো, স্যার, আমি যে বাসায় থাকি, সে বাসায় খাবারের ভেদাভেদ নেই, বাতের রোগীও কেউ নেই, কিন্তু পান থেকে চুন খসলেই বেগম সাহেবা সামনে যা পান তা দিয়ে মারেন, অশ্লীল ভাষায় গালি দেন, তবুও সহ্য করে আছি। কারণ, বদ-মেজাজী বেগম সাহেবার অন্তরটা বড়, অনেক সময় নিজের পাতের মাছ-গোশত আমার পাতে তুলে দেন। আমার মা বাবা ও ভাই বোনদের বছরে দুবার কাপড় চোপড় দেন, এজন্য কিল খেয়েও টিকে আছি। একবার আমার অসুখ হয়েছিল, বিছানায় পড়েছিলাম কয়েক দিন। বেগম সাহেবা তখন আমাকে যে সেবা যত্ন করেছেন, এমন সেবা যত্ন তাঁর কোন ছেলেকেও করতে দেখিনি। বড় ডাক্তার বাসায় এনে আমার চিকিৎসা করিয়েছেন।

প্রত্যেকেই নিজ নিজ অভিজ্ঞতা পেশ করলো। কে কোথায় কিভাবে শুয়ে থাকে, কোন সাহেবের বেগম সাহেবা ক্লাবে পড়ে থাকেন, কোন্ সাহেব আর বেগম দিন রাত ঝগড়া করেন, কোন্ সাহেব মদ গিলে মাতাল হয়ে বাসায় ফেরেন, কোন্ বাসায় সাহেব আর বেগম সাহেবা এক বাসায় বাস করেও গায়ে গায়ে লাগেন না, কার যুবতী মেয়ে কার সংগে কিভাবে পালিয়ে গেছে, কোন্ বাসায় সাহেবের কোন্ ছেলে বদমায়েস, কোন্ জোয়ান চাকরানী কোন্ বাসায় একদিনও থাকতে পারে না, এসব কাহিনী তারা বললো, যার বাকি অংশ লিখিত ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তাই আমিও সে সব কাহিনী এখানে তুলে ধরলাম না।

তাদের মর্মজ্বালা তাদের ভাষায় শুনে একটি কথাই বারবার মনে হলো, উপর তলায় অনেক অমানুষ যেমন আছেন, তেমনি আছেন বহু মানুষও। সাহেবরা চাকরী করেন, বাসার চাকর ও চাকরানীও চাকরী করে, কিন্তু দুই চাকরীর দুই সিঁড়ির ব্যবধান যেন আসমান জমিনের ফারাকের মত। নিজে যা খাও তা চাকর বাকরকে খেতে দাও, তারা তোমাদের অধীন। রাসূল (সাঃ) এর এই অমিয়বাণী উপর তলার খুব কম সংখ্যক বাসাতেই প্রবেশ করেছে।

বাসার চাকরদের কোন সমিতি নেই, চাকরী বিধি নেই, তাই তারা কোন সাধারণ নিয়মের অধীন নয়, যাদের আশ্রয়ে তারা থাকে, তাদের মর্জি, তাদের মানসিকতা আর তাদের আচার আচরণই গৃহ-ভৃত্যদের নিয়ন্ত্রণ করে।

সকলেই মানুষ, সকলেই স্রষ্টার সৃষ্টি। সুখ দুঃখের অনুভূতি রাজার যেমন আছে, তেমনি প্রজারও আছে। এতটুকু জ্ঞান থাকলে এক বাসায় তিন ধরনের তিনটি ভিন্ন মানের তরকারী হতে পারে না। ওরা ক্রীতদাস নয়, মাহিনায় রাখা চাকর। সাহেব অফিসের চাকর আর আব্দুলরা বাসার চাকর, ফারাক শুধু এতটুকু। সাহেবদের অফিসিয়াল ছুটি আছে, কিন্তু আব্দুলদের নেই। সাহেবের পেটে ব্যথা অনুভব হলে অসুস্থতার ছুটি পান, কিন্তু কোন কোন

www.pathagar.com

আব্দুলের কঠিন পেটের ব্যথা হলেও শুনতে হয় সে নাকি কাজে ফাঁকি দেয়ার জন্য ভাণ করছে। বাসার চাকরের অসুখ হওয়া নিষেধ, তাদের ক্লান্তি আসতে পারে না, তাদের ঘুম রাতে দু' তিন ঘন্টার বেশী হওয়া অনুচিত। তাদের ঘুম থেকে উঠতে হবে সবার আগে আর ঘুমাতে যেতে হবে সবার পরে। বাসার চাকরদের সমাজ সামাজিকতা থাকতে পারে না। সাহেবের ছেলে সাহেবের পকেট থেকে অথবা বিছানার নীচ থেকে টাকা চুরি করে নিয়ে গেলে বাসার চাকরকে চোর সাব্যস্থ করে সাহেব-নন্দনের দোষটা তার উপর চাপিয়ে দেয়া হয়। বাসার চাকর মানেই চোর। কাঁচা মরিচ একবার একশত গ্রাম পঞ্চাশ পয়সায় এনেছে তো যেন অপরাধ করেছে। এই দামে রোজই আনতে হবে। বাজারে জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি পেলেও বাসার চাকররা যেভাবেই পারুক, বাজার-মূল্যকে স্থিতিশীল রাখতে হবে।

সব বাসার সব চাকর যেমন অসৎ ও চরিত্রহীন নয়, তেমনি সব বাসার সব সাহেব আর বেগম সাহেবাও জল্লাদ জল্লাদনী নন। ব্যতিক্রম সব স্তরে আছে, কিন্তু আমার বাচ্চা মানুষের বাচ্চা আর ঝি চাকর কুত্তার বাচ্চা, তেমন মানসিকতা থাকা উচিত নয়।

আবু যর (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসুলে খোদা (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের চাকর চাকরানী ও দাসদাসীরা প্রকৃত পক্ষে তোমাদেরই ভাইবোন। তাদের আল্লাহতালা তোমাদের অধীনস্ত করেছেন। সুতরাং আল্লাহ যার ভাইকে তার অধীন করে দিয়েছেন, সে তার ভাইকে যেন তাই খাওয়ায় যা সে নিজে খায়, তাকে তাই যেন পরিধান করতে দেয়, যা সে নিজে পরিধান করে। তার সাধ্যের বাহিরের কোন কাজ যেন তার উপর না চাপায়। একান্ত যদি চাপান হয়, তবে তা সমাধা করার ব্যাপারে তাকে সাহায্য করা উচিত। (বুখারী শরীফ)

ক্লাবে, হোটেলে আর পার্টিতে গিয়ে রোজ রোজ সাহেবরা চাইনীজ আর বিরিয়ানী খাচ্ছেন, চাকর বাকররা তা অবশ্য চায়না অথবা তারা অফিসিয়াল লেবাসও চায় না। সামাজিক লেবাস অর্থাৎ কোট পালতুন পেতে কোন চাকরই আবদার করে না। কিন্তু চাকরের সামনে মুরগীর রাণ টানবেন, তাকে গোশতহীন ঠ্যাংটাও দেবেন না, এটা কেমন কথা? স্যুট আপনার থাক, একখানা লুঙ্গিতো তাকে দেবেন, তাও কি দেবেন না? নিজের সন্তানকে 'বাবা' বলে সম্বোধন করবেন অথচ নিজের ছেলের সমবয়সী চাকরটাকে কুত্তার বাচ্চা, হারামজাদা বলে বকাঝকা দেবেন, তাতো হতে পারে না। এক ঘরে তিন মানের রান্নাতো হওয়া উচিত নয়। এদের ক্রীতদাস আর দাসী জ্ঞান না করলে এমন ব্যবহারতো কখনো করা যায় না। যে সব বাসার চাকর চাকরানীদের প্রতি ক্রীতদাস আর ক্রীতদাসীর মত ব্যবহার করা হয়, এমন প্রায় কুড়িটি বাসার মিয়া বিবির খোঁজ খবর নিয়ে আমি দেখেছি, এসব বাসার সাহেব আর বেগম যেমন, তাদের অধীনস্থ চাকর চাকরানীরা ব্যবহার পায় তেমন। তবে এক্ষেত্রে বেগম সাহেবাদের ভূমিকাই মুখ্য। আমি এই পুস্তকে যত ঘটনার উল্লেখ করেছি, তাতে দেখা যাবে যে, অধিকাংশ ঘটনার জন্য নিরংকুশ ভাবে বেগম সাহেবারা দায়ী। দু' এক ক্ষেত্রে সাহেবের ভূমিকা ছিল হেলপার হিসাবে।

www.pathagar.com

কোন কোন বাসার ঝি-চাকরের উপর এমন অত্যাচারও করা হয় যে, অত্যাচারের চিহ্নগুলো পত্রিকার পাতায় ছবি হিসাবে দেখলেও আঁতকে উঠতে হয়। এসব লোমহর্ষক ঘটনা বেগম সাহেবারাই যে ঘটিয়ে থাকেন, তা তথ্য-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত।

বেগম সাহেবাদের হাত খুবই নরম। ঝি-চাকরদের হাতে মারলে নরম তুলতুলে হাতে ব্যথা লাগে। তাই তারা ঝি-চাকর নির্যাতনে ব্যবহার করেন বেত, চামচ, খন্তা, ডাইল ঘুটনী, গরম ফেন, গরম পানি, গরম লোহার ছেঁকা, লাঠি, লাথি, আগুন ইত্যাদি। আমি ব্যক্তিগতভাবে এমন ঘটনাও দেখেছি যে, বেগম সাহেবা চাকরানীর মাথা ফাটিয়ে হাসপাতালে নিয়ে গেছেন। ফাটা মাথা সেলাই করে আবার বাসায় নিয়ে এসেছেন। পিতলের বড় চামচ দিয়ে আঘাত করে আংগুল ভেংগে দিয়েছেন ৭/৮ বছরের কাজের মেয়ের, এ ঘটনাও দেখেছি। খন্তা আগুনে লাল করে ছেঁকা দেয়ার ঘটনাতো এই রাজধানীতে কয়েকটি ঘটেছে। উচ্ছিষ্ট ভক্ষণের জীব ছাড়া তাদের অন্য কিছু কখনো ভাবেন না এই বেগম সাহেবারা।

উচ্চ শিক্ষিত বেগম সাহেবারা এমন কেন করেন তাদের ঝি-চাকরদের সাথে? এমন নির্যাতনের ট্রেনিং তারা কিভাবে কোথায় পেলেন? এ কি খান্দানী ট্রেনিং, যা বাপের বাড়ী থেকে পেয়েছেন? নাকি স্বামীর অবৈধ আয়ে হঠাৎ যারা বেগম সাহেবা হোন, তারা কেমন বেগম সাহেবা হলেন, তা টেষ্ট করার জন্যই কি এমন করেন?

ঝি-চাকর নির্যাতনের আধুনিক স্টাইল আধুনিক পরিবারে আধুনিক বেগম সাহেবাদের দ্বারা নিয়মিত অনুশীলন হচ্ছে। তারা যে আদর্শ গৃহিনী, তাদের সামনে থেকে পান থেকে চুন খসতে পারে না, একথা প্রমাণ করার জন্যও বোধ হয় জল্লাদনীর আচরণ করেন।

আধুনিকাদের হাতে যত ঝি-চাকর নির্যাতিত হয়েছে এবং যাদের কাহিনী ও ছবি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, সে সব ঘটনার সংখ্যা এক দুটি নয়, অসংখ্য। এসব ঘটনা প্রমাণ করে যে, শতকরা ২/৩টি ঘটনায় ঝি-চাকর নির্যাতনে বেগম সাহেবার সাথে সাহেবও শরীক থাকেন। কিন্তু বাকি ৯৮টির সাকুল্য 'কৃতিত্ব' বেগম সাহেবাদের।

আমি অবশ্য একথা বলি না যে, প্রত্যেক বাসার চাকর-চাকরানী সৎ ও ভাল। তবে বাসার টাকা পয়সা যা খোয়া যায়, সবই চাকর-চাকরানীরা চুরি করে, একথা শত ভাগ যেমন সত্য নয়, তেমনি শতভাগ মিথ্যাও নয়। কেউ কেউ চুরি করে, কিন্তু সকলে নয়। চুরি গেলেই বাসার ঝি-চাকরদের শুধু সন্দেহ করতে হবে, তাদের প্রহারে প্রহারে জর্জরিত করতে হবে, ছেঁকা দিতে হবে, এ কেমন বিচার? বেগম সাহেবার মস্তান ছেলে হরদম চুরি করছে, গহনা নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, ঘরে ঘরে মস্তান ছেলেরা মা বাবার পকেট কাটছে, তাদের অপরাধও কোন কোন ক্ষেত্রে ঝি-চাকরদের উপর এসে পড়ে, এমন নজিরও অনেক আছে।

চাকর-চাকরানীর নির্যাতনের বহু ঘটনা সামনে নিয়ে এ কথা বলা যায় যে, বেগম সাহেবারা যেমন, তাদের বাসার চাকর-চাকরানীরা ব্যবহার পায় তেমন। সাহেবের সঙ্গে চাকর-চাকরানীদের প্রায়ই কোন সম্পর্ক থাকে না। সাহেবের কানে বেগম সাহেবা যা তুলে

www.pathagar.com

দেন, তাই সাহেবরা সাধারণত বিশ্বাস করেন। ঝগড়াটিয়া বদমেজাজী ক্ষুদ্র অন্তরের যেসব মহিলা আছেন, তারা হঠাৎ বড় ঘরে এসে বেগম সাহেবা হয়েছেন, তারা বউ হয়ে না এসে সুপারভাইজার হিসাবে স্বামী গৃহে এসেছেন। তাদের হাত ও ঠোঁট সমানে চলে। হাত চলে চাকর-বাকরদের ক্ষেত্রে আর ঠোঁট চলে শ্বশুর শাশুড়ী ও ননদের ক্ষেত্রে।

মানবাধিকার আইন ও এ্যাকশন যদি রান্না ঘর পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয় আর আইন এবং এ্যাকশন যদি ভেদাভেদের তোয়াক্কা না করে যথাযথভাবে প্রয়োগ হয়, তাহলে আশা করা যায়, জল্লাদনী মেজাজের বেগম সাহেবাদের অত্যাচার থেকে ঝি-চাকররা বাঁচতে পারবে।

এবার পাঠক পাঠিকারা আমার সংগে চলুন সরেজমিনে অর্থাৎ ঘটনাস্থলে। তাহলেই বুঝতে পারবেন যে, এক শ্রেণীর বেগম সাহেবা নিয়ে যে সব মন্তব্য করলাম, তা সঠিক কিনা এবং ঝি-চাকরদের আমি ক্রীতদাস আর দাসীদের সংগে যে তুলনা করেছি, তাও সত্য কি না। চলুন, বিভিন্ন ঘটনা-স্থল পরিদর্শন করে আসি।

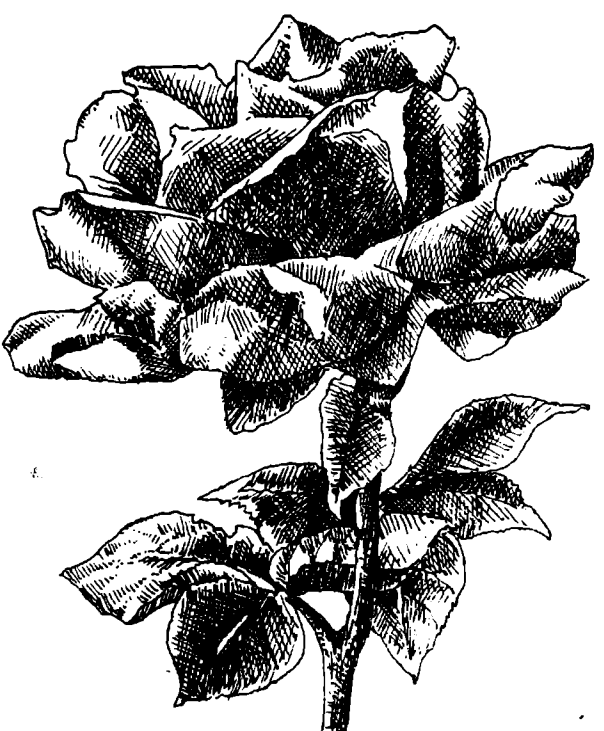

www.pathagar.com

মুর্শেদারা স্রোতে ভাসা শেওলা

স্রোতে-ভাসা শেওলা। ঠিকানাহীন, গন্তব্যহীন। কোথাকার শেওলা কখন কোন্ ঢেউয়ের আঘাতে স্রোতের সংগে এসে মিশে ভেসে ভেসে চলছে, কোথায় তার চলার শেষ, কউ তা জানেনা, শেওলাতো জানেই না। এই শেওলার মতই জীবন-নদীর স্রোতে ভেসে চলে অসংখ্য ভাসমান মানুষ। তাদের ঠিকানা নেই, গন্তব্য নেই, শুধু ভেসেই চলে। ঢেউয়ের তালে তাল রেখে শেওলা যেমন উপরে উঠে, নীচে নামে, আবার প্রবল চাপে কিছুক্ষণ অদৃশ্য হয়ে যায়, আবার ভাসে, ঠিক অনুরূপভাবে অনেক ভাসমান মানুষের মত আমার এ আলোচনার মুর্শেদা রংপুর জেলার পলাশবাড়ির নান্দিশয় গ্রাম থেকে ভেসে ভেসে চলে আসে রাজধানী ঢাকায়। রাজধানীতে এসে আর এক ঢেউয়ের আঘাতে স্রোতের পরিবর্তন ঘটে। সেই স্রোতের আবর্তে ঘুরপাক খায় কিছুদিন, তারপর আবার ভাসতে থাকে। এখন সে কোন্ মোহনায় আছে, তা আমি জানিনা।

গৃহকর্ত্রী [illegible] ঢাকা মুখ

রাজধানীর মোহাম্মদপুরের বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটির ২ নম্বর সড়কের ৩০৩/ই নম্বর বাড়ীতে আশ্রয় নেয় কাজের মেয়ে হিসাবে মুর্শেদা। চলে যাচ্ছিল তার দিনরাতের প্রহর গুলো কোনভাবে। অনেক সুখ আর শান্তি সে চায়নি, সে এমন আশাও করেনি। কারণ, সুখ শান্তি ভোগের যোগ্য সে নয়, এটা সে অল্পবয়সের মেয়ে হয়েও বুঝে, আর বুঝে বলেই মুখ বুজে সুখ-শান্তির বিপরীত যা আছে, তা সয়ে যাচ্ছিল।

www.pathagar.com

বিবি সাহেবা যা খেতে দিতেন, তা খেত, যা পরতে দিতেন, তাই পরতো, যখন ঘুমাতে বলতেন, তখন ঘুমাত, যখন জাগতে বলতেন, তখন সে জাগতো, ঠিক যেন রোবট। ধমক-তিরস্কার, গালি-গালাজ মুর্শেদা প্রায়ই শোনতো, কিন্তু এসব গায়ে মাখতো না। কারণ, সে গরীবের মেয়ে, বাসায় কাজ করে, তার গায়ের চামড়া যে অনেক শক্ত থাকা উচিত।

দিন যায় রাত আসে। রাতশেষে ভোরের আলো দেখে সে দিনের কাজকর্ম শুরু করে, আবার আসে রাত। এভাবে দিন কাটে মুর্শেদার। কিন্তু তার ভাগ্যাকাশে হঠাৎ একদিন কালো মেঘের ঘনঘটা শুরু হল। গর্জনের পর গর্জন হতে লাগলো, একদিন বজ্রাঘাতও ঘটল। এ বজ্রাঘাতে সে নিহত হলো না বটে, কিন্তু আহত হলো মারাত্মকভাবে। আহততো হবেই, সে যে মস্তবড় 'অপরাধ' করেছে। তার অপরাধটা কি, তা একটু শুনুন। সন তারিখ বারসহ যতটুকু বিস্তারিত বলা যায়, ততটুকু আমি বিস্তারিতভাবে বলছি।

এই 'অপরাধের' ঘটনাটি ঘটে ১৯৯০ সালের ১৩ই মে রোববার। বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটির এই বাড়ীর গৃহকর্ত্রীর নাম খোরশিদা নবী। তিনি আদাবর এলাকার রোজবার্ড কিন্ডার গার্টেন স্কুলের অধ্যক্ষা। উচ্চশিক্ষিতা মহিলা। কারণ, তার পেশা-পদবী তাই বলে। তিনি মুর্শেদার বয়সের ছেলে-মেয়েকে কিন্ডারগার্টেন স্কুলে কিন্ডারগার্টেন সিষ্টেমে আদর্শ নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করে থাকেন। এমন অধ্যক্ষার শিক্ষা নিকেতনে শত শত মা-বাবা তাদের সন্তানদের আদর্শ নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার জন্য পাঠিয়ে থাকেন এবং নিশ্চিন্ত থাকেন যে সন্তানেরা মানুষ হচ্ছে। কিন্তু তাঁরা কোন্ আদর্শের মাথা গরম অধ্যক্ষার কাছে সন্তান পাঠিয়ে থাকেন, তা বুঝতে পারেন খুব তাড়াতাড়ি, যেদিন তারা এই তথাকথিত 'আদর্শ' অধ্যক্ষার ভয়ংকর চরিত্র-কাহিনী ও ছবি সংবাদপত্রে দেখতে পান।

এই অধ্যক্ষার বাসায় কাজ করতো মুর্শেদা। ঘটনার দিন সে রান্নাঘরের পানির কলের পাশে বাসন মাজছিল। চুলায় ছিল দুধ। দুধ গরম হওয়ার পর চুলার পাশে নামিয়ে রাখেছিল। তার প্রথম 'অপরাধ', সে কেন চুলার পাশে গরম দুধ নামিয়ে রাখলো। দ্বিতীয় 'অপরাধ', ফুলগাছে পানি দিতে কেন বিলম্ব করলো। শিশু-শিক্ষালয়ের অধ্যক্ষার মেজাজ এই ডবল অপরাধের কারণে বিগড়ে যায়। মুর্শেদার এই দু'টি অপরাধের শাস্তি তিনি না দিয়ে কি পারেন? শাস্তি দিতেই হবে। অধ্যক্ষার দেয়া শাস্তিও তো মামুলি হওয়া উচিত নয়। তাই তিনি এই মাত্র-নামিয়ে রাখা গরম দুধ ঢেলে দেন মুর্শেদার পিঠে। মুর্শেদার পিঠে গরম দুধ ঢালার পর ঠান্ডা হন ফুলন মেজাজি অধ্যক্ষা। মুর্শেদা 'ও মাগো ও বাবাগো ও আল্লাহগো' বলে বুক-ফাটা চিৎকার শুরু করে। অসহ্য জ্বালা যন্ত্রণা। চিৎকার না দিয়ে কি পারে? এই চিৎকার দেয়াটাও ছিল অবাধ্যতার আর এক 'অপরাধ'। কারণ, অধ্যক্ষার শাস্তি নীরবেই তার সহ্য করা উচিত ছিল, কিন্তু অবুঝ মুর্শেদা বুঝলো না। তার বুক, গলা, কান, পেটসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে ফুসকা পড়ে চামড়া ঝলসে গেল। যন্ত্রণায় মুর্শেদা চিৎকার শুরু করলে অধ্যক্ষা একে বে-আদবী মনে করেন। এই বে-আদবীর উচিত শিক্ষা দেয়ার জন্য তাকে তিনি

www.pathagar.com

একটি কক্ষে প্রায় বিনা চিকিৎসায় আটকিয়ে রাখেন। হয়তো টুকটাক চিকিৎসাও করেন। ঘটনার ৫দিন পর অর্থাৎ ১৮ই মে শুক্রবার মুর্শেদাকে এই অধ্যক্ষা বাসা থেকে বের করে দেন। এলাকার কোন এক সুহৃদ ব্যক্তি মুর্শেদাকে এ অবস্থায় নিয়ে যান মোহাম্মদপুর থানায়। মুর্শেদার সব কথা শ্রবণ করার পর পুলিশ নথিভুক্ত করে মামলা এবং গৃহকর্ত্রী খোরশেদা নবীকে গ্রেফতার করে। মোহাম্মদপুর থানার একজন সাব ইন্সপেক্টর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মুর্শেদাকে ভর্তি করে দেন। মুর্শেদা এই হাসপাতালে কিছুদিন চিকিৎসাধীন থাকার পর সুস্থ হয়ে ওঠে। তারপর আবার স্রোতে-ভাসা শেওলার মত ভাসতে ভাসতে কোন্ ঘাটে গিয়ে ভিড়ে তা কেউ জানে না। এখন সে কোথায় কি অবস্থায় আছে তা জানা যায়নি। মানবাধিকার সংস্থাও মুর্শেদার পরবর্তী সময়ের হাল অবস্থার কোন খবর রাখেনি। খবরের কাগজও ফলোআপ নিউজ পরিবেশন করেনি। তাই মুর্শেদা বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই কোন না কোন ঠিকানায় আছে, সুখে অথবা দুঃখে।

মুর্শেদাদের জীবনে সুখ-দুঃখের অনুভূতি আছে, সুখে শান্তিতে থাকার বাসনা আছে, জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের আকাংখা আছে, সোহাগী কণ্ঠে ডাক শোনার ইচ্ছা আছে, কিন্তু বঞ্চনা নামের একটি বস্তু তাদের সমস্ত ইচ্ছা বাসনাকে নিঃশেষ করে দেয়। বঞ্চনা ছাড়া তারা সবই হারায়, তাই ওদের জীবন হচ্ছে স্রোতে-ভাসা শেওলার মত।

রংপুর জেলার পলাশবাড়ীর নান্দিশয় গ্রামে যদি কেউ কখনো যান অথবা এই গ্রামের কেউ যদি আমার এই বইটি পড়েন, মুর্শেদার দুঃখময় জীবনের এই অধ্যায় পাঠ করেন, তাহলে মুর্শেদার খবর জানাবেন, সে কোথায় আছে এবং কিভাবে আছে। আমি বেঁচে থাকলে পরবর্তী সংস্করণে সংবাদদাতার নামসহ মুর্শেদার জীবনের অবশিষ্ট কাহিনী প্রকাশ করবো।

একবার মুর্শেদাকে কল্পনার চোখে সামনে নিয়ে ভাবুন তো, আপনি তার বাবা বা ভাই, আপনার কন্যা বা বোনের গায়ে এভাবে কোন জল্লাদনী গরম দুধ ঢেলে দিয়েছে। আপনি এ দৃশ্য দেখে কি স্থির থাকতে পারবেন? না, স্থির থাকতে পারবেন না। যদি স্থির থাকতে না পারেন, তাহলে আমরা কেন এভাবে ভাবিনা যে, সকল মুর্শেদা আমার কন্যা বা বোন। তাদের গায়ে গরম দুধ ঢালা মানে আমাদের দেহে দুধ ঢেলে ঝলসে দেয়া। এই যদি হয় তাদের ব্যাপারে আমাদের অনুভূতি, তাহলে মুর্শেদাদের কিভাবে খোরশেদা নবীদের হাত থেকে রক্ষা করা যায়, এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত।

অধ্যক্ষা তো গ্রেফতার হওয়ার পরই মুক্তি লাভ করেছেন। তিনি এখন সব ঝামেলা থেকে মুক্ত, কিন্তু মুর্শেদা যদি বেঁচে থাকে, তাহলে দেহে সে এই অধ্যক্ষার দ্বারা সৃষ্ট ক্ষত-চিহ্ন বহন করে চলছে এবং চলতে থাকবে মৃত্যু পর্যন্ত।

www.pathagar.com

নাসিমার পিঠে আমাদের সমাজচিত্র

ফুলের রানী গোলাপও যদি কলিতে ঝরে পড়ে, তাহলে ঝরা কলিকে গোলাপের মালী বা মালিকও কোন মূল্য দেন্না। এই ঝরা কলি অনাদরের সংগে নিক্ষিপ্ত হয় অন্য কোথাও। যে গোলাপ এক সময় পাপড়ি মেলে সুবাস ছড়ায়, পরিবেশ তার সুবাসে আর সৌন্দর্যে সুবাসিত ও সুন্দর হয়, সে গোলাপের কদর করেন সকলে। যে কলি অকালে ঝরে পড়লো, সে কলির প্রতি মালীর যত্নশীল আন্তরিক পরিচর্যা থাকলে এ কলি হয়তো পূর্ণ প্রস্ফূটিত গোলাপে পরিণত হয়ে সকলেরই আদরের গোলাপে পরিণত হতে পারতো, কিন্তু সে সৌভাগ্য হয়নি কলিটির। ফুটবার আগেই যে কলি ঝরে পড়ে, তার কথা কেউ কখনো স্মরণও করেনা। বনে কত বর্ণের ফুল ফুটে, বিষ বৃক্ষেও ফুল ফুটে, সে ফুলও দেখতে সুন্দর। এ ফুল যখন ফুটে, তখন সে ফুলের হাসিতে গোটা বনের পরিবেশ হেসে উঠে। ধুতরা পাতা, ধুতরাগাছ এবং ধুতরা ফুলের নাম উচ্চারণ করলে অনেকে আঁতকে ওঠেন। কারণ, এই গাছের পাতা কেউ কেউ পরের অকল্যাণ সাধনের জন্য ব্যবহার করে থাকেন; কিন্তু এই ধুতরা গাছের পূর্ণ ফুটন্ত ফুল দর্শকের নজর কাড়ে, মনও ভুলায়।

www.pathagar.com

নাসিমা নামের একটি মেয়ের দুঃখে-গড়া জীবনের যে ক্ষুদ্র অধ্যায় আমি এখানে লেখতে বসেছি, এই নাসিমাও ছিল মানব বাগানেরই একটি ফুল। নাসিমার মত এমন হাজারো ফুলের পরিচর্যার কেতাবী দায়িত্ব সমাজের ওপর ন্যস্ত, কিন্তু নাসিমাদের মত মানব-ফুলের কদর করে না এ সমাজ, তাই তারা ফুটন্ত ফুল হিসাবে ফুটার আগেই কলিতে ঝরে পড়ে। আমার আলোচ্য নাসিমা যার পরিচর্যায় ছিল, তার থেকে নাসিমা কোন পরিচর্যাতো পায়নি বরং কলি বয়সের নাসিমা পেয়েছে শুধু অনাদর আর অত্যাচার। তাই নাসিমাকে তার পরিচর্যাকারী কলিতে ঝরে পড়তে বাধ্য করে। সে পরিণত বয়সে গোলাপ হয়ে ফুটতো, না ধুতরার ফুল হয়ে বিকশিত হতো, তা দেখার আগেই ঝরে পড়তে বাধ্য করা হয়। ঝরে পড়ে গেল কীট-দংশনে নয়, মানব-দংশনে। নাসিমা নামের এই অনাদরের মানব-ফুলের কথা এখন কেউ স্মরণও করেনা। নাসিমাদের কথা ভাববার মত যাদের বুদ্ধি আছে, পরিচর্যা করার মত সম্পদ আছে, তারাও নিজ নিজ সন্তান নামক পুষ্প সেবা যত্নে সর্বক্ষণ থাকেন পেরেশান। এই নাসিমাদের তারা ব্যবহার করেন নিজ নিজ শিশুকে পরিপূর্ণ সুবাসিত ফুলে পরিণত করার কাজে। তাই নাসিমারা অন্যের ফুল ফুটায়, কিন্তু নিজেরা ফুল হয়ে ফুটতে পারে না। এজন্যই বলেছিলাম, এরা কলিতে ঝরে পড়ে, অনাদরে নিক্ষিপ্ত হয়। কাল-স্রোতে ওরা ভেসে যায়, তারপর হারিয়ে যায়।

নাসিমা নামের যে মেয়ের কথা বলছি, যাকে আমি কলিতে ঝরে-পড়া ফুলের সংগে তুলনা করেছি, অনাদরে নিক্ষিপ্ত মানব ফুল বলেছি, এখন তার কাহিনী শুনুন।

এক সময় নাসিমার বাড়ী ছিল পদ্মাপারে, ফরিদপুর জেলায়। নাসিমা বলতে পারে না তার গ্রামের নাম। পদ্মার ভাঙ্গনে গ্রামটি বিলীন হয়ে গেছে। সে যখন ৩ বছরের শিশু, তখন সে মা বাবাকে হারায়। কি যেন এক অসুখ হয়েছিল তার মা বাবার, সে অসুখের নাম নাসিমা জানে না। সে অসুখেই তারা দু'জন মারা যান। তারপর পদ্মার বুকে গ্রামখানিও হারিয়ে যায়। গ্রামকে হজম করে গ্রামের লোকজনকে প্রমত্তা পদ্মা তাড়া করে। ফলে, যে যেদিকে পারে, সেদিকে আশ্রয় নেয়। নাসিমার এক মাত্র খালা হনুফা এই নাসিমাকে কোলে নিয়ে পদ্মা পাড়ি দিয়ে ঢাকায় আসে। ঢাকা হাইকোর্ট মাজার প্রাঙ্গনকে হনুফা নিজের ঠিকানা বানিয়ে নেয় আরও অনেকের মত। শুরু হয় আর এক জীবন। খালা হনুফার কাছেই নাসিমা থাকে। হাইকোর্ট মাজারের প্রশস্ত আঙ্গিনায় নাসিমা ঘুরে বেড়ায়, অন্যান্য শিশুর সাথে খেলা করে সময় কাটায়। অন্যের দয়া-দাক্ষিণ্যে হনুফা আর নাসিমার দিন কাটতে থাকে।

www.pathagar.com

হনুফার বয়স বাড়ে, সে বুড়ীর কাতারে এসে দাঁড়ায়। নাসিমাও কিশোরী বয়সের দিকে পা বাড়ায়। হনুফা নিজের ভাটা বয়সের দুর্বল দেহের কথা ভেবে দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ে আর নাসিমার দিকে তাকায়। নাসিমার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ হনুফা আঁতকে ওঠে। আঁতকে ওঠে এই ভেবে যে, নাসিমাতো হাতে পায়ে বেড়ে ওঠছে, বয়সকে অতিক্রম করেছে তার দৈহিক বৃদ্ধি। হনুফা নিজের দুর্বল শরীরের দিকে তাকিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়, না, নাসিমাকে আর হাইকোর্ট মাজার প্রাঙ্গনে রাখা যায় না। কোন না কোন নিরাপদ আশ্রয়ে রাখতে হয়। হনুফা মনে করে, কোন বাসায় কাজ করতে দেয়াই সবচেয়ে নিরাপদ। সে মনে করে, যদি বাসার সাহেব বেগম ভাল লোক হন আর নাসিমার কপাল থাকে ভাল, তাহলে নাসিমাকে তারা বিয়ে শাদিও দিতে পারেন। এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হনুফা নাসিমার জন্য বাসার কাজ খোঁজতে থাকে। অন্য এক মহিলার সাহায্যে হনুফা মিরপুরের এক বাসায় নাসিমার জন্য কাজ ঠিক করে। এই মহিলাই মিরপুরের এক বাসায় নাসিমাকে নিয়ে যায়। হনুফা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। মাঝে মাঝে এই মহিলার মাধ্যমেই নাসিমার খবর পায়, 'নাসিমা ভাল আছে'। নাসিমা 'ভাল' থাকার খবর শুনলেই হনুফার ভাল লাগে। এভাবে কেটে গেছে দু' বছর। যে মহিলার মাধ্যমে নাসিমার বাসা-চাকরী জুটলো, সেই মহিলাও হারিয়ে গেল। ভবঘুরে জীবন, কে কোথায় ক্ষুধার তাড়নায় দৌড়ায়, কেউ কারও খবর রাখে না। একদিন দেখা গেল, নাসিমা হাইকোর্ট মাজারে এসে হাজির। কি ব্যাপার? নাসিমার গোটা দেহ কেন এত ক্ষত বিক্ষত? নাসিমার এ অবস্থা দেখে হনুফা কান্নায় ভেংগে পড়ে। পৈশাচিক এ ঘটনা! মীরপুর কত নম্বর সেকশনে নাসিমা থাকতো, হনুফা তা জানেনা, নাসিমাও বলতে পারে না। তবে বাসার নম্বর ১৭/৯ মীরপুর, শুধু এইটুকু জানে।

গৃহকর্তার নাম সাখাওয়াৎ হোসেন, গৃহকর্ত্রীর নাম রাণু, সাখাওয়াৎ হোসেন আগে মগবাজার এলাকার কোন এক অফিসে চাকরি করতেন, এখন চাকরি করেন কিশোরগঞ্জে। তিনি এবং তার স্ত্রী, দুই মেয়ে ও এক ছেলের জনক-জননী। নাসিমার এক মামা আছে, সে জুরাইনে রিক্শা মেরামতের কাজ করে।

এ সব কথা একটি পত্রিকার সাংবাদিকের কাছে নাসিমা বয়ান করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বেডে মৃত্যু যন্ত্রণায় চিৎকার করতে করতে। কিভাবে সে মিরপুরের একটি বাসা থেকে খালা হনুফার কাছে আসে, তারপর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হয়, সে কাহিনী অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। মিরপুরের সেই বাসাটিতে নিত্য লাঞ্ছনা গঞ্জনা ও মারধর সয়ে দুবছর অতিক্রান্ত করে নাসিমা। বাসায় রান্নাকরা, কাপড় কাচা, ঘর মোছা ইত্যাদি সব ধরনের কাজ তাকে করতে হতো। কাজ করতে বিলম্ব ঘটলে বা কোন কাজ তার মনমত না হলে নির্যাতন নেমে আসত নাসিমার ওপর। গৃহকর্ত্রীর মেয়েরাও নাসিমাকে প্রায়ই মারধর করত।

২৯শে মে সোমবার (১৯৮৯) রাতের আহারের পর নাসিমার সারাদিনের কাজের অনেক ত্রুটি ধরলেন গৃহকর্ত্রী। তাকে তিরস্কার করলেন। দুই একটা কিল থাপ্পড়ও দিলেন। যে সব অপরাধের জন্য নাসিমা তিরস্কৃত হয় এবং কিল থাপ্পড় খায়, এর অধিকাংশের জন্য নাসিমা

www.pathagar.com

দায়ী নয় বলে গৃহকর্ত্রীকে জানিয়ে দেয়। এটাই ছিল তার সবচেয়ে বড় 'অপরাধ'। মুখে মুখে তর্ক? সাহস তো কম নয়? এ অপরাধের শাস্তি তাকে পেতে হবে। গৃহকর্ত্রী কিছুক্ষণ চিন্তা করে নেন, কি শাস্তি দেয়া যায় 'হারামজাদীকে'। মাথায় আসে এক দুষ্ট বুদ্ধি। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, লোহার রড গরম করে তার শরীরে ছেঁকা দিতে হবে। তিনি আর সময় ব্যয় না করে চুলায় লোহার একটি রড গরম করে নাসিমার মাথাসহ সারা দেহে ছেঁকা দেন। আসমান-ফাটা চিৎকার দিয়ে ওঠলো নাসিমা।

কথায় বলে, নিত্য পাগলকে কে কতবার সামলায়? এ বাসায় এমন মারধরতো সবসময়ই হয়, রোজ রোজ কে কতবার এই ঝামেলা পোহাতে পারে? তাই এবার কেউ এগিয়ে আসেননি। নাসিমাকে রাতে একটি কক্ষে আটকিয়ে রাখা হয়। পরদিন বিকালে এই দালানের নীচতলার কাজের এক মেয়ের সহায়তায় নাসিমা বাসা থেকে বের হয়ে রাজপথে নামতে সক্ষম হয়। দু' বছর আগে যে খালার কাছ থেকে সে এ বাসায় এসেছিল, তার খোঁজে হাইকোর্টের মাজার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়। উদাম দেহে ক্ষত বিক্ষত শরীরে ব্যথায় কাতরাতে কাতরাতে সে এক বাসে উঠে। কতিপয় দয়ালু ব্যক্তি পথে তাকে ২০ টাকা দেন। হাইকোর্ট মাজারে পৌছলে ভাগ্যক্রমে খালা হনুফার সাথে দেখা হয়। নাসিমার এ অবস্থা দেখে হনুফা কান্নায় ভেংগে পড়ে। সবকথা শুনে হনুফা তাকে হাসপাতালে নিয়া আসে। মুমূর্ষু অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। নাসিমার বুক পেট পিঠ পা সহ সারা শরীরে আগুনের তপ্ত রডের আঘাতে সৃষ্ট ক্ষত গুলো গোটাদেহে এমন রূপ ধারণ করে যে, হাসপাতালের যে লোক তাকে দেখেছে, সে মুহ্যমান হয়েছে। নাসিমার জিহ্বাও সামান্য কেটে দিয়েছে গৃহকর্ত্রী। জিহ্বা কেটে দেয়ার কারণ হলো, নাসিমা কেন তার সংগে তর্ক করলো?

পরবর্তী খবর সংক্ষিপ্ত। সঠিক ঠিকানা জানা না থাকার কারণে কোন মামলা হয়নি। তাছাড়া নাসিমাদের জন্য আমাদের দেশের আইন এত পেরেশানও থাকে না। গৃহকর্ত্রীকে আদালতের কাঠগড়ায় এজন্য দাঁড়াতে হয়নি বলে শুনেছি। নাসিমা হাসপাতালে দীর্ঘদিন থাকার পর কিছুটা সুস্থ হয়ে আবার খালা হনুফার কাছে চলে যায়। এ ঘটনার প্রায় দুবছর পর খোঁজ নিয়ে আমি জানতে পারলাম, সে অন্য এক বাসায় কাজ করছে। নতুন বাসার গৃহকর্ত্রী খুব ভাল বলে ও জানতে পারলাম। নাসিমা এখানে কিছুটা আরামে আছে। নতুন বাসার ঠিকানা কেউ দিতে পারেনি, তবে বাসাটি আজিমপুরের কাছে, শুধু এতটুকুই জানতে পারি। এলাকার কোন কোন ছেলে এবং দু' একজন মাতারী প্রতি সপ্তাহে হাইকোর্ট মাজারে আসে। সেই সূত্রেই এ তথ্য জানা যায়।

মাজার প্রাঙ্গনে তার যে খালা ছিল, সে এখন আর সেখানে নেই। কেউ জানে না সে বর্তমানে কোথায় আছে, সে কি বেঁচে আছে, না মারা গেছে, তাও কেউ জানে না। মূল থেকে যারা ছিন্ন, তারাই তো হয় ছিন্নমূল। তাদের খবর কেউ রাখেনা। তাদের জীবন যাযাবরের জীবন।

নাসিমার ভাগ্য যদি ভাল হয়, তাহলে হয়তো সে নতুন সাহেব-বেগমের সহায়তায় জীবনের একটা ঠিকানা পেয়েও যেতে পারে, সে সংসারী হতে পারে, সুখের মুখও দেখতে

www.pathagar.com

পারে আর যদি কপাল তার মন্দ থাকে, তাহলে ঝরা পাতার মত বা অকালে ঝরে পড়া কলিরমত অনাদরের ডাষ্টবিনে নিক্ষিপ্ত হয়ে নিঃশেষ হবে। কারণ, নাসিমারা জন্মই নেয় এ সমাজে জীবিতাবস্থায় মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগের জন্য। এ যন্ত্রণা তাদের শুরু হয় জীবনের শুরু থেকে। মৃত্যুই তাদের জীবনের সব দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্তি দেয়। এজন্য সমাজের অনেক নাসিমা নির্জনে নিভৃতে কেঁদে কেঁদে মৃত্যুকে আহ্বান জানায়। আবার অনেক নাসিমা এই মৃত্যু-যন্ত্রণা বা জীবন-জ্বালার মধ্যেও সুখ নামক পাখিকে ধরবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠে, কিন্তু সুখ পাখি ধরা দেয় না। আশা নামক কুহেলিকার পিছনে নাসিমারা দৌড়াতে থাকে, কিন্তু আশা বরাবরই তাদের সাথে কুহকিনীর মত আচরণ করে।

যে সমাজে নাসিমারা জন্ম নেয়, সে সমাজ নাসিমাদের জন্য নয়, এই সহজ সত্যটা কোন নাসিমাই বুঝে না। এ সমাজ শোষণের পক্ষে, শোষিতের পক্ষে নয়, নির্যাতনকারীর পক্ষে, নির্যাতীতের পক্ষে নয়। নাসিমারা এমন এক অদ্ভুত সমাজে জন্ম নেয়, যে সমাজের মানুষ নাসিমাদের নিয়ে চমৎকার নাটক লেখে, কবিতা লেখে, গল্প লেখে, উপন্যাস লেখে, ছায়াছবি নির্মাণ করে, টেলিভিশনে তাদের জীবন নিয়ে অনেকে অভিনয় করে, পুরস্কার নেয়। নাসিমারাও কবিতা, নাটক ও উপন্যাসের উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু যারা তাদের নিয়ে নাটক করে, কবিতা বা উপন্যাস লেখে, এমনকি রাজনীতিও করে, তারা কিন্তু নাসিমাদের ধারে কাছেও ভিড়ে না। ওদের ভিড়তেও দেয়না, শত গজ দূরে রাখে। তারা যেন শিল্পীর ক্যানভাসে আঁকা ছবি, তফাৎ থেকে দেখতেই সুন্দর। নাসিমারাতো আমাদের সমাজের নাট্যকার, কবি, ঔপন্যাসিক, গল্পকার, গীতিকার, চিত্রনির্মাতা, অভিনেতা অভিনেত্রী এবং রাজনীতিবিদ আর সমাজ বিজ্ঞানী তাত্ত্বিকদের কাছে গবেষণার কাঁচামাল ছাড়া আর কিছু নয়। নাসিমাদের নির্যাতন কাহিনী পত্রিকায় আসে মাত্র একদিন অথবা দু'দিন, বড়জোর তিনদিন, তারপর নাসিমাদের আর খোঁজ নেয় না পত্রিকাওয়ালারাও।

এই সমাজে অনেকেই আছেন, তারা নাসিমাদের জন্য কিছুই করতে পারেন না, করার সাধ্যও নেই, কিন্তু তাদের জন্য মন কাঁদে। অনেকের এই কান্না নাসিমাদের জন্য হয়তো দোয়ার আকারে দরবারে এলাহিতে পৌঁছে। তাই আল্লাহতায়ালা সমাজের কারও না কারও মনে নাসিমাদের জন্য মায়া-মমতা পয়দা করে দেন। সেই মায়ার কারণেই নাসিমারা বেঁচে থাকে, সুখের স্বপ্ন দেখে, কান্নার পর হাসে। কিন্তু আফসোস, সমাজে নেই নাসিমাদের পুনর্বাসিত করার সংঘবদ্ধ প্রয়াস বা পরিকল্পনা। তাই তারা অর্ধ-মৃত অবস্থায় বাঁচে। আমাদের এই নাসিমার জীবনে কি আছে, আল্লাহই ভাল জানেন। আল্লাহর কাছে এই গুণাহগারের নিবেদন, আমার মেয়ের বয়সী নাসিমার জীবনকে তুমি সুখে রাখ।

www.pathagar.com

হাফিজা হারিয়ে গেল চিরতরে

কপালে নেই যে নারীর সুখ, তার কাছে বাপের বাড়ী আর স্বামীর বাড়ী উভয়ই সমান, তবে একটু তফাৎ আছে, তফাৎ হচ্ছে এই, হতভাগিনীরা পিতৃগৃহে পায় শাসন ও সোহাগ, কিন্তু স্বামীগৃহে পায় শুধু শাসন। সোহাগ তাদের নসিব হয়না।

যাকে নিয়ে আমার এ আলোচনা, স্বামীগৃহ তার নসিব হয়নি। স্বামীগৃহে যাওয়ার বয়স তার হয়েছিল বটে, কিন্তু এর আগেই সে প্রাণ হারালো বেগম সাহেবার প্রহারে, যে বেগম সাহেবার বাসায় সে কাজ করতো। এই হতভাগিনীর নাম হাফিজা খাতুন। বয়স ১৫ বছর। এই বয়সই গরীব ঘরের মেয়েদের জন্য ভরা-যৌবন বলা যায়। হাফেজাও তার যৌবনকে ঘিরে স্বপ্ন দেখতো স্বামী গৃহের, স্বপ্ন দেখতো নিজের কোলে পুত্র বা কন্যার, মা ডাক শোনার, সংসার গড়ার। কাজের মধ্যে ডুবে থেকেও সে নানা রঙিন কল্পনা দিয়ে নিজের ভবিষ্যতকে সাজাতো। এমনও হয়তো ভাবতো যে, তার বাপজান তার জন্য কোন এক বর ঠিক করে তাকে নিতে আসবেন,

কিন্তু তার এসব কল্পনা কয়েক মিনিটের নির্যাতনে কোন্ অনন্তলোকে যেন হারিয়ে গেল। হঠাৎ এক সর্বনাশা ঝড়ো-হাওয়া এসে তার আশার ঘরকে উড়িয়ে নিয়ে গেল, দমটাও কেড়ে নিল। হাফিজার কল্পনার জাল বোনা আর স্বপ্নের মায়াবী আমেজ সভ্যতার মুখোশ পরা বেগমের লাঠির আঘাতে চিরতরে মিলিয়ে গেল, হাফিজা হলো লাশে পরিণত। সে তার বাপজানের মুখ দেখেনি মৃত্যুকালে, দেখেছে মানুষরূপী একটি হায়নার চেহারা, যাকে সে 'বিবি সাহেবা' বলতো।

www.pathagar.com

দু' তিনটা পত্রিকায় তার লাশের ছবি আর ঐ নারী-পশুর ছবি ছাপা হয়েছিল, তাও মাত্র একদিন। পত্রিকায় এ নিয়ে আর লেখালেখি হয়নি। ফলোআপ নিউজ ছাপা হয়নি। হবেই বা কেমন করে? হাফিজা খাতুনের পক্ষ যদি সবল থাকতো, তাহলে পত্রিকাওয়ালারা এ নিয়ে অন্তত দেড় দু/মাস পার করতেন, নানা ষ্টোরী ছাপতেন, ষ্টোরী পাওয়া না গেলেও ষ্টোরী তৈরী করতেন।

কাজের মেয়ে হাফিজাকে নিয়ে হৈ চৈ করার মধ্যে তারা তেমন কোন ফায়দা দেখেন নি। তাই সে একদিন কভারেজ পেয়েছিল, এটাই যথেষ্ট। কমার্সিয়াল ইন্টারেষ্ট তাতে নেই। পাবলিকও আজকাল সে ধাচেরই হয়ে গেছে, প্রেম বা সাসপেন্স জাতীয় মার্ডার ছাড়া অন্য কোন মার্ডার কাহিনী পাঠ করতে চায়না। তাই খবরের কাগজ কমার্সিয়াল লাইন ধরেই চলে। দেশবাসীও তাই হাফিজাদের কথা শুধু একদিন জানতে পারে। তারপর কি হলো, তা আর জানা হয়না।

আমাদের সমাজ বড়ই বিচিত্র সমাজ। এই সমাজ কাঠামো এমন সব উপাদানে তৈরী, যা শুধু জটিল, যৌগিক এবং নিস্প্রাণই নয়, নির্মম এবং ব্যাঙ্গাত্মকও বটে। এই সমাজে কারও ঘর ভাঙ্গলে, সংসারে আগুন লাগলে, সুখের সংসার পুড়ে ছাই হলে, নদী শিকস্তি হয়ে কোন পরিবার পথে পথে ঘুরলে বা মামলা মোকদ্দমা আর দেনায় সর্বহারা হলে এদের জীবন-ছবির যে বীভৎস রূপ ফুটে উঠে, সেই রূপ-দর্শনের প্রচুর দর্শক দেখা যায়, কিন্তু তাদের সহযোগিতার মানুষ ডানে বামে বা সামনে পিছনে প্রায়ই দেখা যায়না। এ হচ্ছে আমাদের বর্তমান সমাজ চিত্র। এমন চিত্র এখন গ্রামেও দেখা যাচ্ছে। এ কারণে গ্রাম উজাড় হচ্ছে। গ্রাম ছেড়ে দলে দলে নরনারী আসছে শহরে। কিন্তু এমন দিনও ছিল, গ্রাম ছাড়ার চিন্তাও কেউ করতো না। কারণ, গ্রামের মায়া মমতা মানুষকে ধরে রাখতো, কিন্তু এখন এই মায়া মমতার টানও নানা কারণে দুর্বল হয়ে পড়েছে। এখন গ্রামের মমতা আর কাউকে আটাকায়না। কারণ হয়তো এই, যে গ্রাম তার সন্তানদের অন্ন যোগাতে পারে না, নিরাপত্তা দিতে পারে না, সে গ্রাম নিজ সন্তানদের বুকে জড়িয়ে ধরার অধিকারও রাখেনা।

(উপরে) ইউসুফ এবং করিম ও সালেহা করিম (নীচে) নিহত হাফিজা

যারা শহরে আসে, শহরও তাদের তেমন কিছু দিতে পারেনা, কিন্তু প্রত্যেকের জঠর জ্বালা দূর করার মত ব্যবস্থাটা করে দিতে পারে। শহরে ক্ষুধা-নিবৃত্তির উপায়টা তাই সহজে খুঁজে পাওয়া যায়।

মোমেনশাহী জেলার ধোবাউড়া থানার কড়ইপাড়া গ্রামে হাফিজা ছিল তার পিতা আতাউর রহমানের সাথে। আতাউর রহমানের ৭ কন্যা ও ১ পুত্র। সাত কন্যার মধ্যে হাফিজা ছিল তৃতীয়। প্রথম দুই কন্যা বিবাহিতা। তন্মধ্যে এক কন্যার নাম সাহিদা। সে ঢাকায়

www.pathagar.com

থাকে। হাফিজাও থাকে সাহিদার কাছে। আতাউর রহমান দিনমজুর। দুঃখকষ্টে কোনভাবে দিন কেটে যাচ্ছিল, কিন্তু দারিদ্রের মত মহাদানব কড়ইপাড়া গ্রামে গিয়েও হানা দিল। এই মহাদানবের সংগে আতাউর রহমানেরা কতইবা মোকাবেলা করতে পারে? যখন হাফিজার বাবা বুঝতে পারেন যে, গ্রাম ছেড়ে শহরে পলায়ন ছাড়া অন্য কোন পথ আর খোলা নেই, তখন তিনি গ্রাম ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু এতগুলো সন্তান নিয়ে বেচারা কোথায় যাবে, কে তাদের আশ্রয় দেবে, কি করে এই বিরাট সংসার চালাবে? এসব আত্ম-জিজ্ঞাসা তাকে গ্রাম ছাড়ার সিদ্ধান্ত ত্যাগে বাধ্য করে।

মিরপুর ২ নং সেকশনের ৬৫ বড়বাগের তিনতলা দালানটির মালিক পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান ডঃ বি করিম। তিনি তাঁর ছোট ভাইকে নিয়ে বাস করেন এই দালানের তৃতীয় তলায়। ডঃ করিমের স্ত্রী মারা গেছেন এক যুগ আগে। ২য় তলায় থাকেন ডঃ করিমের বড় ছেলে ইউসুফ এম করিম, তার স্ত্রী সালমা করিম এবং তাদের এক পুত্র ও এক কন্যা। আগে ইউসুফ করিম ভাড়াটিয়া বাসায় থাকতেন। ১৯৯২ সনের মাঝামাঝিতে তিনি সপরিবারে পিতার বাসভবনের ২য় তলায় উঠেন। আগে তিনি আমেরিকান এক জাহাজে চাকরি করতেন। পরে তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে গার্মেন্টস বায়িং হাউসের মাধ্যমে ব্যবসা শুরু করেন, কিন্তু এ ব্যবসায় সুবিধা করে উঠতে পারেননি। ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে রীতিমত এক সংকটে পড়েন। পিতা ডঃ করিম পুত্রের বিপর্যস্ত অবস্থা দেখে ঠাঁই দেন নিজের বাসায়, কিন্তু পুত্রের আচরণ পিতার প্রতি খুব ভাল ছিল না। কয়েক মাস পর পিতা-পুত্রের মধ্যকার সম্পর্কের খুব অবনতি ঘটে। পুত্র দ্বিতীয় তলায় থাকলেও কখনো তৃতীয় তলায় যেতেন না। এমনকি তারই কারণে শিশুপুত্র এবং কন্যা দাদার সাথে দেখা করতে পারত না।

ইউসুফ কার্যত বেকার থাকলেও সালমা ইউসুফ বেকার ছিলেন না। তিনি পার্টটাইম বিভিন্ন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে শিশুদের অংকন শিখাতেন। বিখ্যাত জাহাজ মার্কা আলকাতরা কোম্পানীর মালিক সালমা করিমের ভাই। ৬৫ বড়বাগ বাসায় দারোয়ানি করে আব্দুল হাদী নামের এক ব্যক্তি। সালমা করিম এই আব্দুল হাদীকে একটি কাজের মেয়ে এনে দিতে বলেন। হাদী এনে দেয় হাফিজাকে ১৯৯৩ সালের মে মাসে। এই বাসায় ঝর্ণা (২৮) নামে আরও একটি কাজের মেয়েলোক থাকতো।

বাসা বাড়ীর কাজের মেয়েদের রাতদিন যেভাবে সাধারণত অতিবাহিত হয়, হাফেজার জীবনও সে ভাবে অতিবাহিত হতে থাকে, কিন্তু এই গতানুগতিকতার গতিও একদিন থেমে গেল।

১৯৯৩ সালের ৬ই জুলাই হঠাৎ এক সময় সালমা করিম বলেন, তার পাঁচশত টাকা চুরি হয়ে গেছে। বাসায় টাকা গহনা চুরি হলে সাধারণত বাসার চাকর-চাকরানীকেই সন্দেহ করা হয়। এ ঘটনায় হাফিজাকে সন্দেহ করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, চাউল পড়া, আটা পড়া, রুটি পড়া খাওয়ানোর ভয় দেখানো হয়; কিন্তু হাফিজা যখন কোন 'এলেম' -এর ভয়ে ভীত হল না বরং চুরির অভিযোগ সরাসরি অস্বীকার করলো, তখন শুরু হলো হাফিজার উপর অত্যাচার। তার এই দুনিয়ার জিন্দেগীর শেষ দিন ছিল ১৯৯৩ সালের ৬ই জুলাই মঙ্গলবার।

www.pathagar.com

গৃহকর্ত্রী সালমা করিম (৩৭) বেদম মারপিট শুরু করেন। বাম হাত দিয়ে হাফিজার গলাটিপে ধরে ডান হাতের লাঠি দিয়ে উপর্যুপরি আঘাত করেন। এক পর্যায়ে হাফিজা মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে। কক্ষের দরজা জানালা বন্ধ করেই হাফিজাকে তিনি পিটাচ্ছিলেন। বাসায় ইউসুফ করিম এবং কাজের অন্য মেয়ে ঝর্ণাও ছিল, তারা ছিল অন্য কক্ষে। হাফিজার চিৎকার শুনে তারা বন্ধ দরজার কাছে এসে অনুনয় বিনয় করে। কিন্তু দরজা খুলা হয়নি। দরজা খুলা হয় তখন, যখন হাফিজা আর বেঁচে নেই।

হাফিজার বোন সাহিদা কিন্তু তার বোনের মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে বলেছে অন্য কথা। পাঁচশত টাকা চুরির অভিযোগকে সে 'মিথ্যা অভিযোগ' বলেছে। তার বক্তব্য ছিল এই, সালমা পরকীয়া প্রেমে জড়িত ছিল। স্বামীর অনুপস্থিতে তার বাসায় লোকজন আসত। এসব ঘটনা হাফিজা জানার কারণে তাকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। ডঃ বি করিম বলেছেন, হাফেজা মৃগী রোগী ছিল।

ডঃ বি করিমের বক্তব্য সঠিক বলে আমার মনে হয়নি। হাফেজা এই বাসায় আসে দু' মাস আগে। ৩/৪ মাস ধরে পিতা পুত্রের মধ্যে কথাবার্তা নেই, সন্তানদের পর্যন্ত দাদার কাছে যেতে দেওয়া হয়না। এই যখন অবস্থা, তখন ডঃ বি করিম কিভাবে জানলেন হাফেজা একজন মৃগী রোগী? হাফেজাকে পিটিয়ে মারা হয়েছে, এসত্য প্রত্যেকের জবানবন্দীতে এসেছে। একথা সালমা করিম, ইউসুফ করিম, ডঃ বি করিম, ঝর্ণা ও হাদী নিজ নিজ বয়ানে উল্লেখ করেছেন।

ডঃ বি করিম একটি দৈনিকের প্রতিনিধির সংগে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন 'রাত আটটা পর্যন্ত আমি কিছুই জানিনা। হঠাৎ রাত আটটার দিকে ইউসুফ এবং তার স্ত্রী ছুটে এসে আমার পা জড়িয়ে কি সব বলতে লাগল। এর পরেই জানলাম ঘটনা। রাত আটটায় তারা এসে আমার কাছে মাফ চায় এবং এর প্রতিকারের উপায় জানতে চায়। পরে আমরা সলাপরামর্শ করে প্রথমে টাকা পয়সা দিয়ে হাফিজার আত্মীয় স্বজনকে ম্যানেজ করার সিদ্ধান্ত নেই, কিন্তু দারোয়ান হাদীর কারণে তা আর সম্ভব হয়নি। অতঃপর পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করা শ্রেয় বলে সিদ্ধান্ত নেই। বাসার দারোয়ান হাদী যেহেতু এই কাজের মেয়ে এনে দিয়েছে, তাই দুর্ঘটনার পর তার সাহায্য চাওয়া হয়।

সারা রাত সলাপরামর্শ করে এবং হাদীর মাধ্যমে পরিবারকে লাশ বুঝিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। এজন্য হাফিজার বাড়ী মোমেনশাহী যাবার জন্য মাইক্রোবাস ভাড়া করা হয়। ৭ই জুলাই সকাল ৬টায় হোটেল সোনারগাঁও এর সামনে বাংলাদেশ ট্যুরস থেকে একটি মাইক্রোবাস (ঢাকা মেট্রো-৫০৭৯) ৪ হাজার টাকায় ভাড়া করা হয় মৃতদেহ বহনের কথা বলে। প্রয়োজনে হাফিজার পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেয়ার জন্য প্রায় ৬০ হাজার টাকা সে রাতেই যোগাড় করা হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হাদীকে দেড় হাজার টাকা দিয়ে হাফিজার বোনকে নিয়ে আসার জন্য বলা হয়, তাকে সাথে করে নিয়ে মোমেনশাহী যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

বুধবার তারা সকাল নয়টা পর্যন্ত মাইক্রোবাসে লাশ তোলে হাদীর জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন, কিন্তু হাদী তখনও ফিরে আসেনি। মাইক্রোবাসে লাশ নিয়ে স্বামী স্ত্রী প্রথমে

www.pathagar.com

সোবহান বাগে সালমা করিমের বড় বোনের বাসায় যান। বড়বোন তাদের সাথে মোমেনশাহী যেতে রাজি না হওয়ায় তারা মৃতদেহ নিয়ে ইউসুফ এম করিমের মামার মিরপুরস্থ বাসায় যান এবং থানায় আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নেন। সেই সিদ্ধান্ত মোতাবেক থানার অদূরে হার্ট ফাউন্ডেশনের সামনের রাস্তায় মাইক্রোবাসটি দাঁড় করিয়ে থানায় খবর দেয়া হয়। মিরপুর থানা পুলিশ মৃতদেহ সহ মাইক্রোবাস এবং এই যুগলকে থানায় নিয়ে আসে এবং পরে তাদের গ্রেফতার করে। ঐদিনই তাদের দুজনকে আদালতে হাজির করা হয়। তাদের পক্ষ থেকে জামিনের আবেদন করা হলে আবেদন নাকচ করে দিয়ে তাদের জেল হাজতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এছাড়া বাসার অপর কাজের মেয়ে ঝর্ণা এবং মাইক্রোবাসের ড্রাইভারের জবানবন্দী নেয়া হয় ১৬৪ ধারা মতে আদালতে। হাফিজার লাশের ময়না তদন্ত হওয়ার পর লাশটি তার আত্মীয় স্বজনের হাতে পৌঁছিয়ে দেয়া হয়।

তারপর? তারপর জানা যায় যে, মিয়া-বিবি উভয়েই জামিনে মুক্তি লাভ করেন। সর্বশেষ খবর হলো, মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে। নিষ্পত্তি হতেই হবে। হাফিজার পক্ষ হয়ে কে মামলা চালাবে? এই দুনিয়াতে হাফিজাদের মামলা এভাবেই নিষ্পত্তি হয়। ক্রীতদাসের মত যাদের জীবন কাটে, তাদের ওপর যে অবিচার চলে নিত্যদিন, আদালত তাদের জন্য সুবিচার কি প্রতিষ্ঠা করতে পারবে?

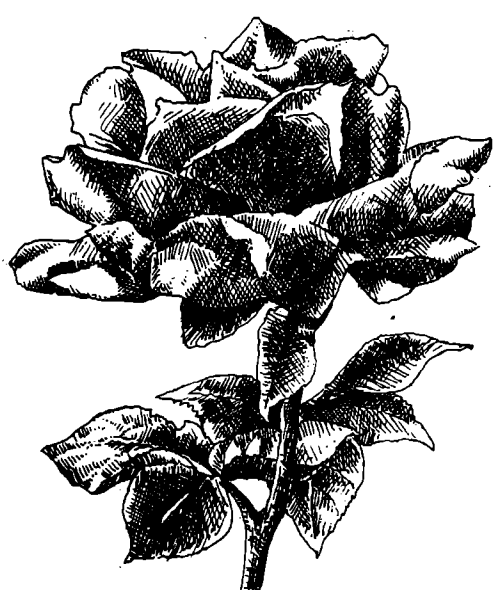

www.pathagar.com

শিল্পী নামের মেয়েটি

নাম তার শিল্পী। খুব সুন্দর ও মিষ্টি নাম। এ নাম রেখেছিল তারই বাবা আরশাদ আলী। সে ছিল একজন দিন মজুর। নিজের নাম পর্যন্ত সে দস্তখত করতে জানতো না। নিরক্ষর দিন মজুর আরশাদ আলী এই মিষ্টি নামটির মর্ম কিভাবে বুঝলো এবং কোথায় এ নাম কুড়িয়ে পেল, এ প্রশ্ন যে কোন মনে জাগা স্বাভাবিক। হয়তো এ নাম কোথাও সে শুনে থাকবে। এই ছন্দময় মিষ্টি নাম কেউ মিষ্টি সুরে কোন মেয়েকে ডাকার সময় আরশাদ আলী হয়তো শুনেছিল। এই নাম তার ভালো লেগে যায়। এই ভাল লাগা নামটি রেখে দেয় নিজের মেয়ের জন্য। কিন্তু শখ করে যে মিষ্টি নাম নিজের মেয়ের জন্য রাখলো, সে হয়তো আশা করেছিল যে, তার মেয়ের জীবনটাও নামের গুণে মিষ্টি মধুর হয়ে উঠবে। কিন্তু শিল্পীর জীবন কালক্রমে মধুময় না বিষময় হয়ে উঠলো, তা তার বাবা দেখে যেতে পারেনি। শিল্পীর বয়স যখন ছয় বছর, তখন তার বাপ মারা যান।

গৃহপরিচারিকা শিল্পী

আরশাদ আলী আর তার স্ত্রী যখন শিল্পীকে কারণে অকারণে সোহাগ করে ডাকতো, তখন কেউ কেউ বলতেন, আরশাদ আলী মিয়া, এ নাম এ ঘরে মানায় না। আধুনিক, ধনী ও শিক্ষিত পরিবারের নাম গরীব ঘরে শোভা পায় না। আরশাদ আলী আর তার স্ত্রী হেসে হেসে বলতো, বাসা তো ছোট, কিন্তু তাই বলে আশা তো ছোট নয়। আমাদের শিল্পী হয়তো বড় ঘরে একদিন যাবে, শিল্পী নাম তার সার্থক হবে।

শিল্পী ৮ বছর বয়সে আধুনিক, ধনী ও শিক্ষিত ঘরেই গিয়েছিল, তবে কাজের মেয়ে হিসাবে। সে ঘরেই শিল্পীর জীবনকে গৃহকর্ত্রী হেনা বিবি শেষ করে দেন আধুনিক যুগের বর্বর কায়দায়। কিভাবে শিল্পীর জীবন আধুনিক বর্বরতা নিঃশেষ করে দিল, সে কাহিনী বিষাদময়, লোমহর্ষক এবং হৃদয়বিদারক।

www.pathagar.com

শুনুন সেই কাহিনী। শিল্পীর পৈতৃক বাড়ি মানিকগঞ্জ জেলার দৌলতপুর থানার জিয়নপুর ইউনিয়নের চড়িডাংগা গ্রামে। আরশাদ আলী যখন মারা যান, তখন শিল্পীর বয়স ছিল ৬ বছর, একথা আগেই বলেছি। দিন-মজুর আরশাদ আলী মৃত্যুকালে রেখে যান স্ত্রী রাবেয়া বেগম, দুই কন্যা ও এক পুত্র। রাবেয়া বেগম তিন শিশু সন্তানকে নিয়ে পড়ে মহা সংকটে। সন্তানদের ভরণপোষনের চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়ে। স্বামীর অবর্তমানে যখন ভরণ পোষণের দায়িত্বভার তারই ওপর পড়েছে, তখন তো আর পিছে হটবার পথ নেই। রাবেয়া বেগম শক্ত হয়, উঠে দাড়ায়, গ্রামে ঝিয়ের কাজ খোঁজতে থাকে। এ বাড়ি ও বাড়ি ঝিয়ের কাজ শুরু করে। ঝিয়ের কাজে কতইবা আয়। এই আয় দিয়েই চারটি প্রাণীর দিনরাত অর্দ্ধাহারে অনাহারে অতিবাহিত হতে থাকে।

১৯৯৩ সালের ২৮শে মার্চ, ঈদ-উল-ফেতর-এর চারদিন পর, চরিডাংগা গ্রামের রফিক নামক একব্যক্তি শিল্পীকে নিয়ে আসে এই রাজধানীতে, কাজ দেয় একটি বাসায়। রফিক এ উদ্যোগ নেয় সৎ নিয়তে, মানবিকতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে। উদ্দেশ্য ছিল এই, যদি চার জনের পরিবার থেকে একটি মেয়ে সরে যায়, তাহলে অন্তত একজনের অন্নবস্ত্র যোগান দেয়ার ভাবনা তো কমে। তাছাড়া শিল্পী যদি মাসে মাসে কিছু দিতে পারে তার মাকে, তাহলেও তো কিছুটা সাহায্য হয়। রফিক সে উদ্দেশ্যেই শিল্পীকে রাজধানীর মিরপুরের শেওড়া পাড়ার একটি বাড়িতে এনে দেয়। বাড়ির কর্তার নাম ফয়েজ হোসেন, তার স্ত্রীর নাম হেনা বেগম।

একরত্তি মেয়ে শিল্পী। বয়স মাত্র আট বছর। গ্রামের অতি গরীব পরিবারের মেয়ে। গ্রামে থাকতে কাজ কর্মে সে মাকে সাহায্য করতো। গ্রামের কাজের সংগে শহরের বাসা বাড়ীর কাজের তো কোন মিল নেই বরং আসমান জমিন ফারাক বলা যায়। গ্রামে থাকতে শিল্পী এ বাড়ি ওবাড়ি, গ্রামের মেঠো পথে, গাছ তলায়, বন বাদাড়ে ও মাঠে ঘুরে বেড়াতো। চলাফেরায় কোন বাধা ছিলনা। কিন্তু শহরের 'বাসা' নামক বন্দীখানায় বাহিরে ঘুরে বেড়ানোর মুক্ত জায়গা নেই। রাস্তায় নানা ধরনের যানবাহন চলে। সর্তক হয়ে পথ চলতে হয়, অন্যথায় নিশ্চিত দুর্ঘটনা, মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। শিল্পী শেওড়া পাড়ার বাসায় এসে দেখে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশ। বন্দী জীবন। বোন ভাই নেই, কার সংগে সে খেলা করবে, মা নেই, কে তাকে সোহাগ করবে। নতুন পরিবেশে এসে কত কথাই না তার মনে পড়ে। কিন্তু এত কথা ভাবলে কি তার চলে? সে তো গরীবের মেয়ে, গরীবের সন্তানদের এত কথা ভাবতে নেই।

গৃহকর্ত্রী হেনা বেগম এটা ওটা কাজ করতে দেন শিল্পীকে। সে সাধ্যমত কাজ করে, এমন কাজও তার উপর চাপিয়ে দেয়া হয়, যা সে পারেনা এবং এমন কাজের পূর্ব অভিজ্ঞতাও নেই। হেনা বেগম তাকে দেখিয়েও দেন না কিভাবে কাজ করতে হবে। অথচ তিনি চান নিখুঁত কাজ। কাজের ভুল ত্রুটির জন্য তিনি দু'একদিন শিল্পীকে ধমক ও গালি দিয়েছেন, কিন্তু তারপর ধমক ও গালির সাথে সাথে নানা ধরনের নির্যাতন শুরু করেন। পুলিশের রিপোর্টে এবং পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে নির্যাতনের কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ আছে।

www.pathagar.com

একদিন শিল্পীকে আলু কুটতে দেয়া হয়। শিল্পী আলু কুটতে পারেনি হেনা বেগমের পছন্দ মাফিক। এ দেখে হেনা বেগমের মেজাজ বিগড়ে যায়। তিনি আলু কুটার বটি দিয়ে শরীরের কয়েক জায়গায় কোপ দেন এবং হাতের রগও কেটে ফেলেন। শিল্পী চিৎকার করে কাঁদতে থাকে। হেনা বেগমের ধমকে সে চিৎকার না করে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

অন্য একদিনের ঘটনা। গৃহকর্ত্রী তাকে রুটি ভাজতে বলেন। সে ঠিক মত রুটি ভাজতে পারেনি। এই 'অপরাধের জন্য' গরম খুন্তি দিয়ে তার মুখ মন্ডল ও শরীরের বিভিন্ন অংশে ছেঁকা দেয়া হয়।

শিল্পী তার জবানবন্দীতে বলে, এপ্রিল-মে (১৯৯৩) দু'মাসে সে অনেক নির্যাতন ভোগ করেছে। তাকে রাতে নাকি অনাহারে রাখা হতো। রাতে তার কোমরে রশি বেঁধে বাথ রুমের মধ্যে আটকিয়েও রাখা হতো।

ভাত রাঁধতে বিলম্ব হওয়ার কারণে অপর একদিন গৃহকর্ত্রীর মেয়ে শিল্পীকে লাঠি দিয়ে বেদম প্রহার করে এবং প্রখর রৌদ্রের মধ্যে হাত পা বেধে গরম টিনের চালের উপর ফেলে রাখে।

৩ রা জুন (১৯৯৩) পবিত্র ঈদ-উল-আযহার পরদিন শিল্পীর ওপর সবচেয়ে বেশী নির্যাতন চালানো হয়। বিভিন্ন নির্যাতনে তার দেহ আগে থেকেই ক্ষত বিক্ষত ছিল। ঈদের পরদিন রাতে নতুন করে নির্যাতন চালানোর পর শিল্পীর অবস্থা সংকটজনক হয়ে পড়ে। শিল্পীর এ অবস্থা দেখে ঐদিনই রাতে গৃহকর্ত্রীর ভাই পিন্টু শিল্পীকে ঢাকা থেকে মানিকগঞ্জের চরিডাংগার পাশের গ্রাম ছাইতনে একটি পাটক্ষেতের পাশে গভীর রাতে ফেলে রেখে যায়। গ্রামবাসীরা পিন্টুকে ধরে ফেলে। কিন্তু অত্যন্ত প্রভাবশালী মস্তানকে তারা ধরে রাখতে পারেনি। গৃহকর্তা ফয়েজ হোসেন ও তার স্ত্রী হেনা বেগমের বাড়িও শিল্পীদের পাশের গ্রাম রামচন্দ্রপুরে। এ ঘটনার খবর পেয়ে শিল্পীর চাচা ঝুমুর শেখ গণ্যমান্য ব্যক্তি ও স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে সাথে নিয়ে অচেতন অবস্থায় শিল্পীকে উদ্ধার করে দৌলতপুর থানা হাসপাতালে নিয়ে যান। ওখান থেকে ৬ই জুন মূমূর্ষ অবস্থায় শিল্পীকে মানিকগঞ্জ সদর হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

৭ই জুন (১৯৯৩) শিল্পীর চাচা পুলিশ সুপারের কাছে লিখিত অভিযোগ করলে পুলিশ সুপার সদর থানার ওসিকে তদন্তের নির্দেশ দেন। ঐ রাতেই সদর থানার ওসি তদন্ত কাজ শুরু করেন। এ ছাড়াও মানিকগঞ্জের জেলা প্রশাসক জনাব মোহাম্মদ মর্তুজা হোসেন মুন্সীর নির্দেশে এ রাতেই এন ডি সি বাবুল চন্দ্র রায় হাসপাতালে শিল্পীর জবানবন্দী রেকর্ড করেন। সদর হাসপাতালের সিনিয়র কনসালট্যান্ট ডাঃ মাহবুব-উল-আলম হাসপাতালের অন্য ডাক্তারদের সহযোগিতায় শিল্পীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তার অবস্থা খারাপের দিকে যেতে থাকে।

ঘটনাস্থল মিরপুর থানাধীন হওয়ার কারণে মিরপুর থানায় ৮ই জুন এ ব্যাপারে একটি মামলা দায়ের করা হয়।

www.pathagar.com

তারপর?

তারপর আর কি হতে পারে তা সহজেই বুঝতে পারেন। গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী, গ্রেফতার, জামিন, মামলা ও মুক্তি। আপোষ নিষ্পত্তি। দুর্বল পক্ষ এগুতে পারেনা, তাই নির্যাতিত দুর্বল পক্ষকে ছবর করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না।

শিল্পীর জীবনের যে ছোট অধ্যায় বিভিন্ন নির্যাতনে ক্ষত-বিক্ষত, সে অধ্যায় কি ক্রীতদাসের জীবনের মত নয়? যদি বলি এর চেয়ে ও খারাপ, তাহলে কি ভুল বলা হলো?

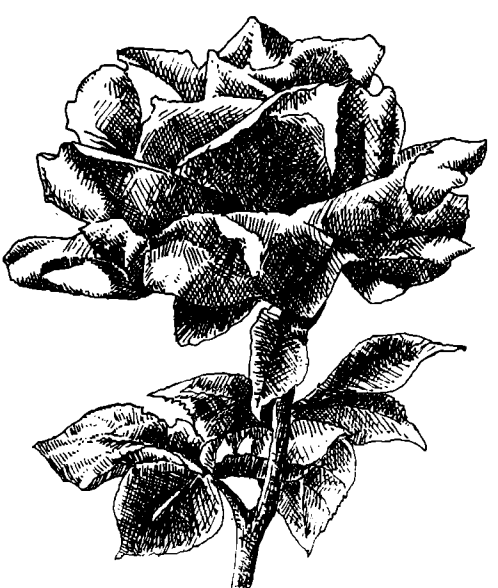

www.pathagar.com

আছিয়াদের জীবন যেন ঝড়ের ছোবল

মোমেনশাহী জেলার হালুয়াঘাট থানার খালিশকুড়ি গ্রামের মরহুম জবান আলীর কন্যা আছিয়া কিভাবে কার মাধ্যমে রাজধানী ঢাকা আসে, তা জানা সম্ভব হয়নি। যে সঙ্গী বা সঙ্গিনীর সাথে আছিয়ার ঢাকা আগমন ঘটুক না কেন, ঢাকা বাস তার সুখের হয়নি।১৯৯১ সালের এপ্রিল মাসের সম্ভবত শেষ সপ্তাহে মোহাম্মদপুরের ২/৪ হুমায়ুন রোডের ইসমাইল নামক এক ব্যক্তির বাসায় সে গৃহপরিচারিকার চাকরী নেয়। ইসমাইল ইউ এস এইডের একজন চার্টার্ড একাউন্টেন্ট। তার দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম মুক্তা ইসমাইল। প্রথম স্ত্রীর সংগে সে মীরপুরে বাস করতো।দ্বিতীয় স্ত্রী মুক্তা থাকতো হুমায়ুন রোডের বাসায়। মুক্তাকে সে দেহ ব্যবসায়ের কাজে লাগায়।এই মহিলাও ছিল এই স্বভাবের। ইসমাইলের সাথে তার স্বামী–স্ত্রী সম্পর্ক ছিল শুধু লোক দেখানোর জন্য। আছিয়া এ বাসায় কিছু দিন গৃহপরিচারিকার কাজ করার পর তাকে মুক্তা আর তার স্বামী দেহ ব্যবসায়ের কাজে লাগাতে চেষ্টা করে। কিন্তু আছিয়া তাতে রাজি হয়নি। বিভিন্ন প্রলোভনও তারা দেখাতে থাকে। কোন অবস্থাতেই যখন তারা আছিয়াকে রাজি করাতে পারেনি, তখন তার উপর দৈহিক নির্যাতন শুরু করে। ১৯ শে জুলাই (১৯৯১) থেকে ২১ শে জুলাই, এই তিন দিন মুক্তা ও তার স্বামী জোরপূর্বক বাহিরের লোক দিয়ে তাকে ধর্ষণ করায়।

আছিয়ার বাহুতে তপ্ত রডের ছ্যাঁকার দাগ

পুলিশের কাছে জবানবন্দীতে আছিয়া বলে, ২১ শে জুলাই (১৯৯১) সকালের দিকে এক সঙ্গে ৮/১০ জন লোক মদ খেয়ে মাতাল হয়ে তার ঘরে ঢুকে আছিয়াকে দেহ দান করতে আদেশ করে।আছিয়া দেহদানে অস্বীকৃতি জানালে দলের কয়েকজন মিলে আছিয়াকে প্রথমে মারধর করে, পরে গৃহকর্তা, তার স্ত্রী ও কয়েকজন মিলে আছিয়ার শরীরে লোহার জ্বলন্ত রড দিয়ে ছেঁকা দেয়। এমনকি তার দেহের একস্থানে রড ঢুকিয়ে দেয়া হয়। সেখান থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়। যন্ত্রণায় সে অচেতন হয়ে পড়ে।কিছুক্ষণ পরে সে জ্ঞান ফিরে পেলে দুজন মহিলা তাকে একটি

www.pathagar.com

বেবী ট্যাক্সীতে ওঠায়। আছিয়া ঝিমিয়ে পড়লে তাকে এরা কমলাপুর রেলষ্টেশনের কাছে ফেলে চম্পট দেয়।

মেয়েটির যন্ত্রণা দেখে এবং তার এ অবস্থায় বর্ণনা শুনে একজন রিকশা চালক তাকে নিয়ে দৈনিক বাংলা অফিসে আসেন। পরে দৈনিক বাংলা থেকে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়। ইমার্জেন্সী মেডিকেল অফিসার এ অবস্থা দেখে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে নেন।

আছিয়ার উপর এই বর্বরোচিত নিপীড়নের কথা পুলিশের আইজি, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ডেপুটি কমিশনার (নর্থ) এবং মোহাম্মদ পুর থানাকে জানানো হয়।

ঐ রাতে মোহাম্মদপুর থানার পুলিশ আছিয়াকে নির্যাতনের অপরাধে মুক্তা ইসমাইলকে গ্রেফতার করে। মোহাম্মদপুর থানার সহকারী দারোগা জনাব বেলাল তার ফোর্স নিয়ে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ৩৫ নং ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন আছিয়াকে সঙ্গে নিয়ে ২/৪ হুমায়ুন রোডের বাসা থেকে উক্ত মহিলাকে গ্রেফতার করে। আছিয়া পুলিশের সামনে নির্যাতনকারী মুক্তা ইসমাইলকে সনাক্ত করেছে।

তারপর?

তারপর আর কি হয়? অর্থ থাকলে সবই ম্যানেজ হয়ে যায়। কিছু দিন জেল হাজত অবশেষে মুক্তি। কিন্তু আছিয়াকে বাকী জীবন লাঞ্ছনা গঞ্জনা নির্যাতন ও ব্যঙ্গ-উপহাসের অজস্র বাণ-বিদ্ধ হয়ে যাতনা ভোগ করতে হবে। এই আছিয়ার কপালে তাই জুটেছে।ক্রীতদাসের মত যার জীবন, তার জীবনে এ পাওনাই তো স্বাভাবিক।

এই রাজধানীতে স্বামী-স্ত্রীর বৈধতার সার্টিফিকেটকে সাইন বোর্ড হিসাবে প্রদর্শন ও প্রচার করে অনেক নারী পুরুষ স্বামী-স্ত্রী পরিচয় দিয়ে বাড়ি ভাড়া নেয়। আশ পাশের বাসায় জানিয়ে দেয়া হল যে, তারা স্বামী স্ত্রী। অতঃপর তারা ভাড়া নেয়া বাড়িকে পতিতা ব্যবসায়ের কাজে লাগায়। কিশোরী যুবতীদের তারা অনুসন্ধান করে সংগ্রহ করে। কারো পরিচয় দেয়া হয় চাকরানী আর কারও পরিচয় দেয় বোন বা ভাতিজি। খদ্দেররা আসেন, ব্যবসা জমে উঠে। এই ব্যবসায়ের আয় দিয়ে তারা চলেন।

বাড়ির অনেক মালিক টের পেলেও এদিকে কান দেন না। তারা অতিরিক্ত ভাড়া পেলেই খুশী। অবশ্য যেসব বাড়িওয়ালা তা পছন্দ করেন না, তারা নতুন কোন ঝামেলায় না গিয়ে চুপে চুপে ভাড়াটিয়া তাড়া করেন। ইসমাইল আর তার স্ত্রী মুক্তা ইসলাম এই আছিয়াকে নিয়ে এ ধরনের ব্যবসা শুরু করতে চেয়েছিল, কিন্তু ধরা পড়ে যায়। এই রাজধানীতে এমন অজস্র স্বামী-স্ত্রী রয়েছে, যাদের ব্যবসাই হচ্ছে এই।

www.pathagar.com

শাহিনারা শুধু কাঁদতেই জন্ম নেয়

গৃহবধু হওয়ার বয়সে যাদের গৃহপরিচারিকার কাজ করে জীবন অতিবাহিত করতে হয়, তারা সুখ পাখিকে খোয়াবেও হয়তো দেখেনা বরং দেখে শকুন-শকুনীরা তাদের দেহের গোশ্ত টানাটানি করছে। গৃহপরিচারিকা শাহিনারা যে সব বাসায় কাজ করে, সেসব বাসায় তারা অনেক সুখ আর শান্তি পাওয়ার আশাও করেনা। এ আশাকে তারা বাদ দিয়েই গৃহপরিচারিকার চাকরী নামক দাসীত্বকে গ্রহণ করে নেয়। তবে বেঁচে থাকার জন্য তথা অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য সর্বনিম্ন একটা ক্ষীণ আশা পোষণ করে থাকে শাহিনারা। এতটুকু পেলেই মনে করে 'যথেষ্ট'। এই 'যথেষ্ট' নামের যৎকিঞ্চিত পেলেই তারা কত খুশী হয়, কিন্তু তাও যখন নসিবে হয়না, তখন কোন কোন শাহিনা সংবাদ শিরোনামে আসে।

১৯৯০ সালের জুলাই মাসের ঘটনা। মৌলভীবাজার জেলার এক শাহিনা কাহিনী জাতীয় দৈনিকের পাতায় ২৬ শে জুলাই (১৯৯০) সচিত্র সংবাদ হিসাবে আসে। অসহনীয় নির্যাতন প্রত্যহ সহ্য করে ক্রমশ সে দুর্বল থেকে দুর্বলতর হচ্ছিল, তার চলৎশক্তি প্রায় নিঃশেষ হতে যাচ্ছিল, নির্যাতনের ব্যথা বেদনায় যখন সে দিন রাত কান্নাকাটি করতো, তখন সে সংবাদপত্রের শিরোনামে আসা তো দূরের কথা, পাড়া প্রতিবেশীর সমবেদনার নজরও তার ওপর পড়েনি। তার ওপর নজর পড়ে তখন, যখন সে মরে মরে অবস্থায় উপনীত হয়। ১৮ই জুলাই জনৈক প্রাইভেট ডাক্তারের ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়, যখন তার ১৮ বছরের যৌবন বয়সের বিয়ের কলি ফুটবার আগেই ঝরে পড়ার উপক্রম হয়।

মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ থানার শমসের নগর লামাবাজারের ব্যবসায়ী ও ঠিকাদার আব্দুল বারী চৌধুরীর বাসায় গৃহপরিচারিকার কাজ করতো শাহিনা বেগম। তার

www.pathagar.com

বাড়িও একই থানার সিংরাউলি গ্রামে। বাসার গৃহকর্ত্রীর নাম মমতাজ বেগম। জানা যায়, এ বাসায় কাজ নেয়ার কিছুদিন পর থেকেই বকা ঝকা আর নির্যাতন হয়ে যায় শাহিনার নিত্যদিনের অবশ্য সহনীয় রুটিন। দীর্ঘ এক বছর এভাবেই কাটে। ১৯৯০ সালের ঈদ-উল-আযহার ৭/৮ দিন আগে থেকেই গৃহকর্ত্রী মমতাজ বেগম নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দেন। ভয়ংকর নির্মম ও পৈশাচিক মানসিকতা তাকে পেয়ে বসে। একদিন শাহিনার লম্বাচুল তিনি কেটে দেন। তারপর শাহিনাকে ১০/১২ দিন তালাবদ্ধ অবস্থায় একটি গৃহে আবদ্ধ রাখেন। একটি লোহার বেড়ি গরম করে তার বুক ও পিঠ সহ কয়েক স্থানে ছেঁকা দেন। এই নির্যাতনের ফলে শাহিনার জবান বন্ধ হয়ে যায়। বাসার কর্তা-কর্ত্রী যখন দেখলেন শাহিনার অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছে, তখন প্রাইভেট ক্লিনিকে ভর্তি করিয়ে দেন।

কমলগঞ্জ থানায় এ ঘটনার একটি জিডি এন্ট্রি হয় বটে, কিন্তু কে করে এই জিডি এন্ট্রীর তদবীর? প্রভাবশালী মহল ঘটনাটিকে ধামাচাপা দেন। অতঃপর শাহিনার অবস্থা কি দাড়ালো, তা আর জানা যায়নি।

শাহিনাদের দোষের অন্ত নেই। তাদের চালচলনে, কথা বার্তায়, কাজ কর্মে এমনকি হাসি ও কান্নাতেও দোষ আর দোষ। ওদের কোন কাজ মমতাজ বেগমদের মত বিবি সাহেবাদের কাছে প্রশংসা পায়না। সোহাগের কণ্ঠে একটা ডাক শুনারও তাদের সৌভাগ্য হয়না। শাহিনারা যতদিন বেঁচে থাকে, ততদিন তারা সমাজের জঞ্জাল হয়ে বেঁচে থাকে। অনাদর আর লাঞ্চনা গঞ্জনা ছাড়া সমাজ থেকে তারা আর কিছুই পায়না। এ সমাজ শাহিনাদের জন্য নয়, একথা শাহিনারা বুঝেনা।

যে কোন নির্বাচন মওসুমে একটি থানায় শত শত সমাজ সেবকের আর্বিভাব ঘটতে দেখা যায়। তারা নাকি 'অক্লান্ত সমাজকর্মী'। অর্থাৎ সমাজ সেবায় তাদের ক্লান্তি নেই। এদেশেও হাজার হাজার সমাজ সেবী প্রতিষ্ঠান মশা মাছির মত ভন ভন করছে, কিন্তু শাহিনাদের কথা কোন 'অক্লান্ত সমাজকর্মী' বা সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান চিন্তায়ও আনেন না। কারণ, আজকালের সমাজসেবা এক ধরণের লাভজনক ব্যবসা। এজন্য এ ব্যবসায়ে শাহিনারা তো কোন কিছুর যোগান দিতে পারেনা। তাই তাদের কথা কেউ ভাবেনা, তাদের দিকে কেউ নজর দেয়না। এজন্য শাহিনারা জীবন যুদ্ধে যতদিন টিকে থাকে, ততদিন বাঁচে, যখন আর টিকতে পারেনা, তখন তাদের মাটির দেহ মাটিতে মিশে যায়।

কি বিচিত্র আমাদের সমাজ! শাহিনাদের পক্ষে কেউ কথা বলার থাকেনা, মমতাজ বেগম আর আবদুল বারী চৌধুরীদের পক্ষে থাকে সবাই। তাইতো পথের জঞ্জাল তুল্য শাহিনাদের এড়িয়ে চলে প্রত্যেকে। 'অর্থ' যে সমাজের মূল চালিকা শক্তি, সুনাম ও প্রতিপত্তির ভিত্তি, আভিজাত্যের বুনিয়াদ, সে সমাজে শাহিনারা ক্রীতদাসের মত খারাপ ব্যবহার পায় সারা জীবন।

www.pathagar.com

রফিকের পিঠে আধুনিক বর্বরতার সীলমোহর

গৃহকর্তা ও কর্ত্রীর অত্যাচারের নির্মম শিকার ১৩ বছরের রফিক। এই রফিককে শেষ পর্যন্ত পঙ্গু হাসপাতালে দীর্ঘদিন চিকিৎসাধীন থাকতে হয়। গরম পানি ঢেলে রফিকের সারা পিঠ ও দেহের অন্যান্য অংশ ঝলসে দেয়া হয়। হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে যন্ত্রণায় রফিক যখন চিৎকার করতো; তখন তার চিৎকারে পঙ্গু হাসপাতালে এক করুণ দৃশ্যের অবতারণা হতো।

পাশবিক নির্যাতনের শিকার কিশোর রফিক

এ অমানবিক ঘটনাটি ঘটেছে মীরপুর ৬ নং সেকশনের এ ব্লকে ১৯৯০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহের প্রথম দিকে ২৩১/২৩২ নং বাসায়। এই বাসার গৃহকর্তা জাফর মিয়া ও গৃহকর্ত্রী রাণু তাদের কাজের ছেলে রফিককে একটি চুরির ঘটনার সাথে জড়িত সন্দেহে চারদিন ধরে আটকিয়ে রেখে বেদম মারধর করেন। পরে ফুটন্ত পানি তার শরীরে ঢেলে দেন। এতে রফিকের সারা পিঠ ঝলসে যায়। সে জ্ঞান হারিয়ে ফেললে তাকে অজ্ঞান অবস্থায় রাস্তার পাশের একটি ডোবায় ফেলে দেয়া হয় ঘরের পরিত্যক্ত আবর্জনার মত। স্থানীয় লোকজন

www.pathagar.com

রফিককে এই অবস্থায় দেখতে পেয়ে মীরপুর থানায় খবর দেয়। পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন রফিককে মুমূর্ষ অবস্থায় উদ্ধার করে পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তি করে।

গৃহকর্তা জাফর মিয়া ও গৃহকর্ত্রী রাণুকে পুলিশ গ্রেফতার করে। জাফর মিয়া মতিঝিল গ্রীন্ডলেজ ব্যাংকে চাকরি করতো।

এ ব্যাপারে মীরপুর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। রফিকদের পক্ষে মামলা বেশী দিন চলেনা। কারণ, রফিকদের পক্ষে মামলা পরিচালনা ও তদবীরের কেউ থাকেনা। ধীরে ধীরে মামলার তেজ কমে আসে। একদিন এই সুযোগে নির্যাতনকারীরা মুক্তি পেয়ে যায়। জাফর মিয়া আর তার স্ত্রীও মামলা থেকে মুক্তি লাভ করে। রফিক এখনও বেঁচে আছে। তার পিঠে বুকে আধুনিক যুগের বর্বর কুশিক্ষিত যুগলের দেয়া আঘাতের চিত্র বহন করে আজও চলছে এবং মৃত্যু পর্যন্ত এভাবে চলতে থাকবে। তার মা বাবা পুত্রের নাম রেখে ছিলেন রফিক। রফিক মানে বন্ধু। মা বাবা হয়তো মনে করেছিলেন যে, নামের বরকতেই সে সকলের কাছে হবে প্রিয়। কিন্তু সেই সৌভাগ্য নিয়ে সে জন্ম নেয়নি। ১৩ বছর বয়সেই জাফর মিয়ার স্ত্রী রাণু বেগমের শত্রুতে রফিক পরিণত হয়। রফিকরা এই সমাজে কত যে 'প্রিয়', তারই স্বাক্ষর বহন করে আছে তার গোটা দেহ। এমন গরীব নিঃসহায়ের জীবন ক্রীতদাসের জীবনের চেয়েও অধিকতর দুঃখময় নয়কি?

রফিকের পিঠের দগ দগ করা এই ক্ষতের ছবি যেদিন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, সেদিনই সরকারের ক্ষমতার মসনদ থর থর করে কেঁপে ওঠা উচিত ছিল। পুলিশ হেড কোয়ার্টারেও ঘুর্নিঝড় বয়ে যাওয়া আবশ্যক ছিল। কিন্তু গাছের একটি পাতাও নড়েনি। ক্ষমতার মসনদ কেঁপে ওঠাতো দূরের কথা ক্ষমতার দুর্গের ফটক পর্যন্ত এ খবর পৌঁছেনি, কারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়নি। প্রশাসনের কোন কোন কর্তার নজরে হয়তো রফিকের এই ছবি পড়েছিল কিন্তু তাদের মনকে নাড়া দেয়নি। মনকে নাড়া দেয়নি এজন্য যে, কোথাকার কোন রফিককে নিয়ে তৎপর হওয়ার এমন কোন্ গরজ পড়লো তাদের? চাকর ছেলে রফিকের কী মূল্য আছে এ সমাজে? তাদের হাতে কত ভাল ভাল মামলা আছে, যেগুলো নিয়ে তৎপরতা দেখানোতে প্রচুর লাভ।

হাঁ, রফিক যদি হতো এই কর্তাদের কারও ছেলে, ভাই বা ভাতিজা, তাহলে তারা দিনে দিনে জাফর মিয়ার বউকে হাশর দেখিয়ে দিতেন। গোটা এলাকায় রীতিমত আতংক ছড়িয়ে পড়তো। রফিক তো তাদের কেউ নয়, রফিকদের জন্য তারা নয়। রফিকরা মরলেই এমন কি যায় আসে?

রফিকের পিঠে আধুনিক যুগের বর্বরতার সুস্পষ্ট সীল মোহর শুধু নয়, রফিকের এই ক্ষতচিহ্ন আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজ প্রশাসনের কলংকের চিহ্ন।

www.pathagar.com

শেফালী ঝরে পড়ে গেল

শেফালী ফুল ঝরে পড়ে গেলেও সাথে সাথে ফুলের হাসি মিলিয়ে যায় না। সে হাসি মিলিয়ে যেতে সময় লাগে বেশ। কিন্তু অত্যাধুনিক পশ্চিমা সংস্কৃতির বিষাক্ত ভাইরাস-আক্রান্ত কোন নারী যদি কোন কারণে মেজাজের ভারসাম্য হারায়, তাহলে সে যে কত ভয়ংকর হতে পারে আর ফুলের নামের মানুষ শেফালীর মুখের হাসি কত যে দ্রুত মুছে ফেলতে পারে, এর প্রমাণ রেখেছেন উম্মে সালমা ইসলাম নামের এক বিমানবালা। বিমানযাত্রীদের এন্টারটেনার বিমানবালার ঠোঁটে লেগে থাকতে হয় সর্বদা হাসি। হাসির ঝলক সৃষ্টি করে যাত্রীদের সামনে আপ্যায়ন সামগ্রীর ট্রে ধরতে হয়। ম্লান মুখে আপ্যায়ন করা চলবেনা, তাতে বিমানের মেহমানদের মনটা খারাপ হয়ে যেতে পারে। ঠোঁটের হাসি অন্তর থেকে নাইবা আসুক, অভিনয় করে এই হাসি তাদের সৃষ্টি করতে হয়। বিমানবালাদের এই হাসির রেওয়াজ চালু করার উদ্দেশ্য হয়তো এই ছিল যে, এই হাসির অভিনয় একদিন তাদের চরিত্র বৈশিষ্ট্য হয়ে দাড়াবে। অন্তরের হাসি ঠোঁটে প্রকাশিত হবে, কিন্তু অন্তরের দিক থেকে যে বিমানবালা পাষাণের হৃদ্দ, ভয়ংকর ভাবে নির্মম, তার ঠোঁট আর অন্তরের মধ্যে কখনো যোগসূত্র সৃষ্টি হয়না। উম্মে সালমা ইসলাম এ সত্যের সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

নিহত শেফালী

যে ট্রাংকে ভরে বুড়িগঙ্গায় ফেলার কথা

কিভাবে এই 'সুহাসিনী' বিমানবালা তার গৃহপরিচারিকা শেফালীকে পিঁড়ীর আঘাতে খুন করেন, লাশটাকে বাথরুমে কিভাবে আটকিয়ে রাখেন, তারপর লাশটাকে কুচি কুচি করে কেটে একটা বিরাট ট্রাঙ্কে ভরার জন্য বাজার থেকে ট্রাঙ্ক, চাপাতি, কাঠের গোড়া এবং লাশকাটার দুজন মানুষ সংগ্রহ করেন, সে কাহিনী যেমন সকরুণ তেমনি পৈশাচিক ও হৃদয়বিদারক।

www.pathagar.com

শেফালীর লাশ টুকরা টুকরা করে বুড়ীগঙ্গায় তলিয়ে দিতে চেয়েছেলেন গৃহকর্ত্রী উম্মে সালমা ইসলাম। এয়ারহোস্টেস এই গৃহকর্ত্রী এ জন্য ৫ হাজার টাকায় দুজন শ্রমিকও নিযুক্ত করেন। কিন্তু শ্রমিক মোজাম্মেল ও আব্দুর রউফ শেফালীর লাশ টুকরা টুকরা না করে বরং গোয়েন্দা পুলিশে বিষয়টি জানায়। পুলিশ ৯ই মার্চ (১৯৯৩) মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মীরপুর ২ নম্বর সেকশনের সি ব্লকের ১৮ নম্বর বাড়ির তিন তলার বাথ রুম থেকে শেফালীর লাশ উদ্ধার এবং গৃহকর্ত্রী উম্মে সালমা ইসলামকে গ্রেফতার করে। ১১ই মার্চ বৃহস্পতিবার সালমাকে আদালতে হাজির করে।

নিহত শেফালীর গ্রামের বাড়ি ময়মনসিংহ ,বয়স ১৬/১৭। ৮ই মার্চ মধ্যরাতে ঠুনকো একটি বিষয়ে তর্ক বিতর্কের এক পর্যায়ে বেধড়ক মারপিট করলে শেফালীর মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে। তার মৃত্যুর পর লাশ রেখে দেয়া হয় বাথ রুমে। মঙ্গলবার পর্যন্ত ওই বাথরুম সালমা ব্যবহার করেননি। শেফালীর খুনের সময় বাসায় সালমার দু' বছরের ছেলে ও অন্য একজন লোক ছিল। তার স্বামী মুজাহিদুল ইসলাম ছিলেন তখন লন্ডনে।

মঙ্গলবার সকালে সালমা একজন বেবী ট্যাক্সি চালকের সহায়তায় বাজার থেকে ট্রাংক, বটি ও চাপাতি এবং ৫ হাজার টাকায় মোজাম্মেল ও রশীদ নামে দুজন শ্রমিক যোগাড় করেন। তবে কাজটি কি, তা তাদের জানানো হয়নি। বাসায় নিয়ে মোজাম্মেল ও রশীদকে শেফালীর লাশ দেখিয়ে বলা হয়, এই লাশটি কেটে টুকরা টুকরা করে বুড়ীগঙ্গায় ডুবিয়ে দিতে তাদের নিয়োগ করা হয়েছে। শ্রমিকদ্বয় শেফালীর লাশ দেখে আঁতকে ওঠা সত্ত্বেও তারা 'কাজটি' করে দিতে রাজি হয়।

মোজাম্মেল ও রশীদ ফিরে আসার পথে বাসায় না গিয়ে চলে যায় মহানগর গোয়েন্দা দফতরে। একজন কর্মকর্তাকে ঘটনা জানালে তিনি দুজন শ্রমিককে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির মালিকসহ পুলিশ নিয়ে তিন তলায় ওঠেন। এ সময় উম্মেসালমা পায়চারি করছিলেন। পুলিশ শেফালীর লাশ উদ্ধার করে। সে সময় সালমা খুন ও লাশ গুম করার কথা স্বীকার করেন। পুলিশ সালমা ছাড়াও ২ জন মহিলাসহ ৮ জনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য গোয়েন্দা দফতরে নিয়ে যায়। অন্যদের ছেড়ে দেয়া হয়। সালমাকে পুলিশ গ্রেফতার করে।

এদিকে ডিবি অফিসে জনৈক সাংবাদিকের এক প্রশ্নের জবাবে সালমা জানান, তার স্বামী মুজাহিদুল ইসলামের সঙ্গে কাজের মেয়ে শেফালীর অবৈধ সম্পর্ক গড়ে উঠছিল। তাদের অতিরিক্ত মাখামাখিই হত্যার কারণ। তিনি বলেন, আমি প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলছিলাম। বিমান বালা উম্মেসালমা ইসলাম ৩ টি কারণে কাজের মেয়ে শেফালীকে খুন করার কথা আদালতে স্বীকার করেছেন। গ্রেফতারের পর গোয়েন্দা পুলিশের কাছে সালমা যে সব তথ্য দিয়েছিলেন, তা তিনি একইভাবে আদালতেও দিয়েছেন। বিমানবালা বলেছেন, কাঠের পিড়ি দিয়ে শেফালীকে মেরেছি। পিড়ির আঘাত পেছন দিকে লেগেছিল। তবে কোথায় লেগেছিল তা বলতে পারি না। সে মরে যাওয়ায় লাশ টেনে বাথরমে নিয়ে রেখে দেই। গোয়েন্দা পুলিশ বেলা ২টার দিকে সালমাকে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে

www.pathagar.com

হাজির করে। ম্যাজিস্ট্রেট জনাব মোহাম্মদ আবদুল হান্নানের কাছে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী প্রদানের ইচ্ছা ব্যক্ত করলে ম্যাজিস্ট্রেট সালমাকে ৩ ঘন্টা ভেবে দেখার সময় দেন। বিকেল ৫টায় ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় সালমা স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী দেন। একটি সূত্র জানায়, সালমা জবানবন্দীতে বলেছেন, স্বামীর সাথে অবৈধ সম্পর্ক থাকায় শেফালীর উপর তিনি ক্ষিপ্ত ছিলেন। স্বামী বিদেশে যাবার পূর্বে শেফালী ফ্রিজ নষ্ট করে ফেললেও কিছু বলতে পারেননি। তাছাড়া ছেলেকে ইচ্ছে করে কোল থেকে ফেলে দিলে শেফালী ভুল স্বীকার না করেই স্বামীর সাথে অবৈধ সম্পর্কের জন্য বেপরোয়া আচরণ করে। সম্প্রতি স্বামী লন্ডনে চলে যাওয়ায় শেফালীর উপর প্রতিশোধ নেয়ার এ চেষ্টা। পরিণামে শেফালীর মৃত্যু।

সালমা আরো বলেছে, শেফালী পিড়ির আঘাতে মারা যাওয়ার পর লাশ গুম করার জন্য তৎপর হয়ে পড়ে। বটি দিয়ে লাশ কেটে ট্রাংকে ভর্তি করে দূরে ফেলে দেয়ার জন্য কমলাপুর থেকে ৫ হাজার টাকায় মোজাম্মেল ও রউফকে নিয়ে আসে। রাতে শেফালী মারা যায়।

পরদিন সন্ধ্যার পর লাশ গুম করার পরিকল্পনা করা হলেও পুলিশ এসে লাশ উদ্ধার করে। স্বীকারোক্তি প্রদান শেষে আদালত সালমাকে জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দেন। পুলিশী প্রহরায় তাকে কোর্ট হাজতে এবং পরে জেল হাজতে নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশ জানায়, লাশ গুম করার পরিকল্পনা জানার জন্যে ঐ বাড়ীর অপর একজন গৃহ পরিচারকা ও আইনজীবীকে সাক্ষী করা হয়েছে।

এখানে প্রশ্ন জাগতে পারে, যে গৃহপরিচারিকাকে খুন করা হয়েছে, তার জীবনতো ক্রীতদাসীর মত ছিল না, চরিত্রদোষেই সে প্রাণ হারিয়েছে। কিন্তু আমার পাল্টা প্রশ্ন, চরিত্রহীনাকে খুন করলেন কোন চরিত্রবান মহিয়সী? যদি তার মৃত্যুর কারণ চরিত্রই হয়ে থাকে, তাহলে তার চরিত্র নষ্টের জন্য দায়ী কি এই যুগল নয়? শেফালীর জীবন যদি গৃহ পরিচারিকার জীবন না হতো, তাহলে তার এভাবে কলংকের বোঝা মাথায় নিয়ে নির্মমভাবে চিরবিদায় নিতে হতো না। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ আল্লাহই ভাল জানেন। তবে গৃহপরিচারিকা শেফালীরা মরলেও অপবাদ নিয়ে মরে। কারণ, জীবন যে তাদের ক্রীতদাসীর মত।

www.pathagar.com

কবর থেকে হোসনেআরার প্রত্যাবর্তন

প্রত্যন্ত পল্লী সত্যানন্দী গ্রামের মেয়ে হোসনেআরা। একদিকে দরিদ্র পিতার সংসারে অভাবের ছোবল, অপরদিকে ঘরে সৎ মা, হোসনে আরার বয়স তখন বড় জোর ৭/৮ হবে। শিশু কিশোর কালের দূরন্তপনার সময়েই হোসনেআরাকে গৃহপরিচারিকার কাজ নিতে হয় একই গ্রামের সচ্ছল গৃহকর্তা আবু দাইয়ানের বাড়িতে। গৃহকর্তা আবু দাইয়ান তখন টগবগে যুবক। এরই মধ্যে গৃহপরিচারিকা হিসেবে নতুন জীবন কাটতে থাকে হোসনেআরা। পিতা মাতার আদর স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়ে অপরের ঘরের সুখ পরিচর্যা করতে করতেই হোসনে আরা যুবতী হয়ে উঠে। স্বপ্ন দেখতে থাকে বধূবেশে কোন এক নতুন ঘরে যাবে রাঙা বৌ হয়ে, কিন্তু না। তার সমস্ত স্বপ্ন বালির বাঁধের মত ভেঙ্গেচুরে তছনছ হয়ে গেল। নির্মম মৃত্যুর শিকার হয়ে এই সুন্দর পৃথিবী থেকে তাকে বিদায় নিতে হলো।

১৯৯৩ সালের ১৪ ই সেপ্টেম্বর সকালের দিকে বিষক্রিয়ায় হোসনে আরা মারা যায়। মারা যাবার আগে হোসনে আরা তার চাচার বাড়িতে সকলের সামনে বিষক্রিয়ায় কাতর হয়ে বলতে থাকে, গৃহকর্তা দাইয়ান আমাকে কি যেন খাইয়েছে। হোসনে আরার এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর পরপরই শুরু হয় ঘটনা ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা। প্রভাবশালী মহলের সহযোগিতায় হোসনে আরাকে তড়িঘড়ি করে দাফনও করে ফেলা হয়।

মৃত্যুকালে হোসনে আরা নাকি ৪ মাসের অন্তঃসত্বা ছিল, গ্রামের লোকজন থেকে তা শুনা যায়। বিষ প্রয়োগে হোসনেআরার মৃত্যু ঘটিয়ে দাইয়ানের পাপ লুকাবার জন্য এমন করা হয়, এমন কথাও গ্রামের কেউ কেউ বলাবলি করেন।

কিন্তু শত চেষ্টা করেও হোসনে আরার অস্বাভাবিক মৃত্যুকে লোকচক্ষুর আড়াল করা যায়নি। অভিযোগ যায় পুলিশের কাছে। সংবাদ প্রকাশিত হয় একটি দৈনিকে এই শিরোনামে "২৪ ঘন্টার মধ্যেই মৃত্যুর ২৯ দিন পর লাশ তোলা হয় কবর থেকে"।

তারপর সে লাশ নারায়ণগঞ্জ জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়। অভিযুক্ত গৃহকর্তা ও তাঁর ৩ ভাই এলাকার ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানসহ আরো কয়েকজন এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায় সেদিন।

১৩ই অক্টোবর বুধবার (১৯৯৩) বেলা প্রায় ১০টা। নারায়ণগঞ্জ থেকে একজন ম্যাজিস্ট্রেট আড়াই হাজার থানায় গিয়ে উপস্থিত হন এবং হোসনেআরার লাশ কবর থেকে উঠানোর জন্যে

www.pathagar.com

আড়াই হাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শিয়া মোহাম্মদ শহীদ, কনস্টেবল শামসুল হক ও আবদুল হান্নানকে সাথে নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট সত্যানন্দী গ্রামের কবরস্থানে গিয়ে হাজির হন। ম্যাজিস্ট্রেট নারায়ণগঞ্জ থেকে ৪ জন ডুম নিয়ে গিয়েছিলেন কবর থেকে লাশ উঠাবার জন্য।

১২ই অক্টোবর মঙ্গলবার দৈনিক বাংলার বাণীতে প্রথম পৃষ্ঠায় "যুবতীর লাশ খেয়ে ৬ শিয়ালের মৃত্যু" এ শিরোনামে হোসনে আরার মৃত্যুর সংবাদটি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

হোসনেআরার পিতা হাবিবুর রহমান, চাচা ওসমান গনি ও ইউপি মেম্বার মোহাম্মদ শাহজাহানসহ আরো কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ যখন ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ কর্মকর্তা কবরস্থানে গিয়ে লাশ উঠানোর কাজ শুরু করেন, তখন এক অভাবনীয় করুণ দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। হোসনেআরার পিতা তার কপাল ও বুক চাপড়িয়ে আহাজারি করে বলতে থাকেন "দাইয়ান (গৃহকর্তা) আমার মাইডারে বিষ খাওয়াইয়া মাইরা ফালাইছে। তোমরা আমার হোসনারে ফিরাইয়া দাও। হে মাবুদ, আমার মাইডারে যারা মাইরা ফালাইছে, তুমি হেগ বিচার কইরো।"

হোসনেআরার কবর ঘিরে তখন প্রায় সহস্রাধিক মানুষ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে। সবার চোখ মুখ থেকেই যেন হোসনেআরার পিতার আহাজারির প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। অবশেষে বেলা প্রায় ১২ টার দিকে কবর থেকে হোসনে আরার লাশ উঠানো হলো। মাথার চুলগুলো ঠিক থাকলেও দেহের বেশীরভাগ মাংসই মাটির সাথে মিশে গেছে। বলতে গেলে কংকাল সার লাশ কবর থেকে উঠিয়ে একটি চটের বস্তায় করে বেবীটেক্সি করে নারায়ণগঞ্জে পাঠিয়ে দেয়া হয়। বেবীটেক্সিটি যখন একটু একটু করে চলতে শুরু করলো, হোসনে আরার আত্মীয়-স্বজনরা তখন হাউমাউ করে কাঁদতে থাকেন। উপস্থিত অনেকের চোখেই তখন পানি।

হোসনেআরারা কখনো দৈহিক নির্যাতন ভোগ করে, আবার কখনো নৈতিক নির্যাতন ভোগ করে। এই হোসনেআরার উপর দাইয়ান তার বিলাসী খেয়াল চাপিয়ে প্রথমে নৈতিক নির্যাতন চালায়। তারপর দৈহিক মৃত্যু ঘটবার জন্য বিষ খাইয়ে দেয়। হোসনেআরারা দাইয়ানদের কখনো ভোগের বস্তু, আবার কখনো ডাস্টবিনের উচ্ছিষ্ট। কারণ, হোসনেআরাদের জীবন তো ক্রীতদাসীর জীবন।

www.pathagar.com

মুনিবের বাসায় মুনিরের বন্দীজীবন

যে সব বাসার বেগম সাহেবারা চাকর-চাকরানীদের ক্রীতদাস আর ক্রীতদাসী ভিন্ন অন্য কিছু জ্ঞান করেন না, তাদেরই কেউ কেউ চাকর চাকরানীদের প্রহার ও গালি-গালাজ ছাড়াও আর একটি শাস্তি দিয়ে থাকেন, যে শাস্তির নাম 'কক্ষ-বন্দী শাস্তি'। গোস্বা উজাড় করা মারধরের পর আটকানো হয় পরিত্যক্ত কোন কক্ষে। দানা-পানি দেয়া হয়না কয়েক বেলা। পেশাব পায়খানার জন্য যেমন হাজতীদের শৃংখলিত অবস্থায় বাহির ভিতর করা হয়, এদের বেলায়ও তাই করা হয়। যখন বন্দী বা বন্দীনী ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ে, জীবন বিপন্ন হওয়ার উপক্রম হয়, তখন বন্দী দশা থেকে মুক্ত করা হয়। কোন কোন বেগম সাহেবা 'অবাধ্য' চাকর চাকরানীকে কক্ষ-বন্দী না করে খাটের খুঁটিতে বেধে রাখেন। পায়ে শৃংখল লাগিয়ে রাখতেও আমি দেখেছি কোন এক বাসায়। এমন অনেক ঘটনারও খবর শুনেছি বিভিন্ন জন থেকে, তবে এ ধরনের শাস্তি যাদের দেয়া হয়, তাদের সবাই কিশোর বয়সের। বয়স্ক পুরুষ বা মহিলাকে এ শাস্তি দেয়া হয় কিনা, তা আমি জানিনা। হয়তো কোন কোন বয়স্ক চাকর চাকরানীর বেলায় এমন ঘটনা ঘটতেও পারে।

কোন কোন বেগম সাহেবা চাকর-চাকরানীদের 'বাসা-বন্দী' ওকরে থাকেন কখনো কখনো। চাকর বা চাকরানীকে ঘরে আটকিয়ে কয়েক ঘন্টার জন্য আত্মীয় স্বজনের বাসায় বেড়াতে যান। তাতে অবশ্য তালাবদ্ধ বাসার ভিতরের চাকর বা চাকরানীর কোন অসুবিধা সাধারণত হয়না, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে অসুবিধা সৃষ্টি হয় বটে। আমি ব্যক্তিগতভাবে একটি বাসার গৃহপরিচারিকার খবর জানি। বেগম সাহেবা তাকে বাসায় রেখে বাহিরে তালা দিয়ে মার্কেটে চলে যান, কিন্তু এই কিশোরীর ছিল মৃগী রোগ। বেগম সাহেবা মার্কেটিং করে

www.pathagar.com

বাসায় প্রবেশ করে দেখেন কিশোরী মেঝেতে পড়ে ছটফট করছে। বেগম সাহেবার চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে এসে দেখেন এ অবস্থা। এ যে মৃগী রোগী, বেগম সাহেবা তা জানতেন, কিন্তু এ অবস্থা যে হবে, তা ভাবেন নি।

ঘটনা এমনও ঘটতে শুনেছি, এক দু' ঘন্টার জন্য তালা দিয়ে রেখে দু' একদিন পরও বাসায় ফিরেছেন সাহেব ও বেগম। এখানে ১৯৯০ সালের জুন মাসের একটি ঘটনা বলছি। বাসার চাকরকে বেগম সাহেবা সরল মনেই আটকিয়ে দেশের বাড়ি চলে যান। ৯ দিন পর বাসায় ফেরেন। এই ৯ দিনে ঘটেছিল, সে কাহিনী শুনুন–

মুনির নামে দশ বছরের একটি ছেলে ৯ দিন মীরপুর ১২ নম্বর সেকশনে 'এ' ব্লকের ১০৩ নম্বর বাসায় দুঃসহ বন্দী জীবনযাপন করে। সে ওই বাসায় কাজ করতো। দু' দিনের কথা বলে গৃহকর্ত্রী মুনিরকে ঘরে বন্দী করে রেখে কুমিল্লায় বেড়াতে যান। ফিরতে বিলম্ব হয় ৯ দিন।

মুনিরের বন্দী–জীবন শুরু হয় ১৯৯০ সালের ১৪ই জুন থেকে। ওই দিন এই বাসার ভাড়াটিয়া মুজিবর রহমানের স্ত্রী ছেলেমেয়েসহ দেশের বাড়ি কুমিল্লায় চলে যান। যাওয়ার সময় বাড়ির দোতালায় একটি স্বল্প পরিসর জায়গায় মুনিরকে রেখে বাহির থেকে দরজা বন্ধ করে দেন। গৃহকর্ত্রী মুনিরকে বলেছিলেন, "আমরা দেশের বাড়ি বেড়াতে যাচ্ছি। দু' দিনের মধ্যে ফিরে আসবো। এভাবে থাকতে পারবি তো?" মুনির শিশুসুলভ চিত্তে মুনিবের কথায় সায় দিয়েছিল, কিন্তু বন্দীজীবন এতো দীর্ঘস্থায়ী হবে, সে তা ভাবেনি। সে এও বুঝতে পারেনি একাকী বন্দীজীবনের জ্বালা কত দুঃসহ । শুধু যে বন্দীজীবনের জ্বালা, তা নয়, তার সাথে ছিল ক্ষুধার জ্বালা। ঘরে তার কোন খাবার ছিলনা। শুধু দু' মুঠো চাল ছাড়া গৃহকর্ত্রী মুনিরের খাবারের কোন ব্যবস্থা করে যান নি। আশপাশের লোকজন গ্রীলের ফাঁক দিয়ে মুনিরের খাবার যোগান দিয়েছে।

মুনির এই ক' দিন ধরে চিৎকার করে কান্নাকাটি করছে। মাঝেমাঝে ছোট পরিসর বারান্দায় এসে গ্রীলে মাথা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো। লোকজন দেখলেই চিৎকার করে বলতো, "আমাকে একটু বের করে নিয়ে যান।" তার করুণ চিৎকার শুনে পথচারীরা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতো। লোকজনের সহানুভূতি থাকলেও তাদের করার কিছুই ছিলনা। দরজার তালা ভেঙ্গে তাকে বের করে আনার দায়–দায়িত্ব কেউ নিতে চাননি।

দোতালা থেকে গ্রীল দিয়ে ঘেরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে অশ্রুসিক্ত নয়নে পথচারীদের বলতো, "এভাবে আমি আর থাকতে পারবো না। আমাকে বের করে নিয়ে যান।"

মুনির মাঝে মাঝে কাপড় এনে গলায় লাগিয়ে ফাঁস নেয়ার চেষ্টা করতো, বুঝিয়ে বললে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকতো। কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম থানায় মুনিরের বাড়ি। পিতার নাম আবদুল খালেক। সে চার মাস ধরে ঐ বাসায় কাজ করে।

বলুনতো এবার, ক্রীতদাসের জীবনের চেয়েও কি মুনিরের জীবন খারাপ ছিল না?

www.pathagar.com

তলপেটে প্রচন্ড লাথিতে ফিরোজা মরলো

কাজের মেয়ে ফিরোজা বেগম (১৪) নির্মম ও পাশবিক অত্যাচারে মারা গেছে। সেই নিপীড়নের বর্ণনা দিতে গিয়ে আঁতকে ওঠেছেন ময়না তদন্তকারী চিকিৎসকরাও। তাঁরা ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী নন, কিন্তু তাঁদের অভিজ্ঞ চোখে ফিরোজার সমস্ত শরীরে নির্যাতনের যে চিহ্ন তাঁরা দেখেছেন, তা বড় ভয়ংকর।

কিশোরী ফিরোজার শরীরে তারা দেখতে পান দীর্ঘদিন ধরে ক্রমাগত নির্যাতনের ফলে সৃষ্ট অসংখ্য ক্ষত এবং জমাট রক্তের দাগ। ২৬শে জুন, ১৯৯২ সাল। ১৮/১১ মনেশ্বর রোডের জনৈক লোকমান হোসেনের বাড়ি থেকে পুলিশ ফিরোজার লাশ উদ্ধার করে। ফিরোজা ওই বাসায় কাজ করত। নির্যাতনে ফিরোজার মৃত্যুর পর তার লাশ গায়েব করার উদ্দেশ্যে গৃহস্বামী একজন কাঠমিস্ত্রিকে ডেকে একটি বড় কাঠের বাক্স বানানোর অর্ডার দেন। কিন্তু অর্ডার অনুযায়ী বাক্স বানাতে গিয়ে মিস্ত্রির সন্দেহ হয়। মিস্ত্রি সে ঘটনা আশপাশের লোকজনকে জানায়। এরপর ঐ বাক্সে লাশ ভর্তি করে ভ্যানযোগে সরানোর সময় প্রতিবেশীরা টের পায়। তখন তারা পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠায়। ঢাকা মেডিকেল হাসপাতাল মর্গে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা ফিরোজার ময়না তদন্ত করেন। ময়না তদন্ত করতে গিয়ে তার শরীরের দিকে শুধু তাকিয়েই তারা ঘটনার ভয়াবহতা উপলব্ধি করেন। এরপর কাটাছেঁড়া শেষে তৈরী হয় তার ময়না তদন্ত রিপোর্ট। রিপোর্টে বলা হয়, তলপেটে আঘাতজনিত কারণে সৃষ্ট নিউরোজেনিক শকে ফিরোজার মৃত্যু ঘটেছে।

ময়না তদন্তকারী চিকিৎসকরা জানান, অপুষ্টিজনিত কারণে এমনিতেই মেয়েটির শরীর ছিল হাড়সর্বস্ব, এরপর সমস্ত শরীরে ছিল পুরানো আঘাতের চিহ্ন। এই আঘাতগুলোর ফলে সৃষ্ট ক্ষত থেকে বোঝা যায় যে, এসব আঘাত তিন থেকে ছ' মাসের পুরানো আঘাত। তবে সাম্প্রতিক আঘাতের চিহ্নও ছিল অসংখ্য। আঘাতগুলো সম্ভবত বেত জাতীয় কিছু দিয়ে করা হয়েছে। যার ফলে প্রতিটি আঘাতেই দু'টি করে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। এ ছাড়া তার সারা শরীরেই ত্বকের নীচে পুরানো জমাট রক্তের দাগ ছিল। ময়না তদন্তকারী চিকিৎসকরা জানান, এভাবে ক্রমাগত আঘাত চলতে থাকলে হয়ত আরোও কিছুদিন পর তার এমনিতেই মৃত্যু ঘটত, কিন্তু সম্প্রতি তার মৃত্যু ঘটেছে তলপেটে লাথি বা অনুরূপ কোন আঘাতের ফলে সৃষ্ট নিউরোজেনিক শকে।

www.pathagar.com

এদিকে ফিরোজার গৃহস্বামী দাবি করেছিল 'জ্বরে এবং দূর্বলতার কারণে' ফিরোজার মৃত্যু ঘটেছে। এ ঘটনার সত্যতা কতটুকু তা জানতে চাওয়া হলে বিশেষজ্ঞরা জানান, ফিরোজার পরিপাকতন্ত্র ছিল সম্পূর্ণ অক্ষত। জ্বরে সৃষ্ট কোন আলসারের চিহ্নই ছিলনা কোথাও। তাই এ দাবি গ্রহণযোগ্য নয়।

হাসপাতালের খাতায় তার নাম এনট্রি করা হয়েছে ফিরোজা। তার প্রকৃত নাম খোদেজা। পিতার নাম আকবর আলী ফকির। গ্রাম চুনারচর, মেহেদীগঞ্জ, বরিশাল।

যারা চাকরানী হয়ে বাসায় কাজ নেয় আর ক্রীতদাসীর মত ব্যবহার পায় আর লাথির আঘাত পেয়ে মরে, তাদের জন্য কি এই 'সভ্য' সমাজ? সমাজপতিরা কি এনিয়ে কোন চিন্তা ভাবনা করবেন না?

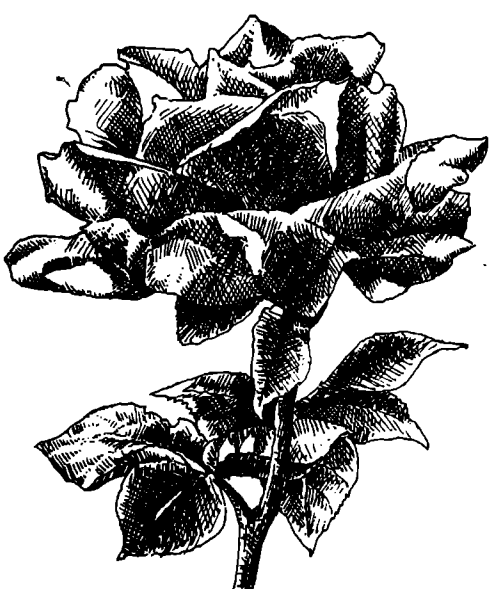

ফিরোজার জন্য এই গোলাপ উপহার

www.pathagar.com

আধুনিক বর্বরতার শিকার কিশোরী মনি

১৯৯৩ সালের নভেম্বর মাস। পংগু হাসপাতালের বেডে কিশোরী মনি শায়িতা। জীবনের সবচেয়ে নাজুক ও যন্ত্রণাকাতর সময় সে কাটাচ্ছে। দেশের জনগণ ও প্রধানমন্ত্রীর কাছে সে জানাতে চায় তার ফরিয়াদ। আকুল কণ্ঠে সে বলেছে, আমি বাঁচতে চাই। আমাকে বাঁচার গ্যারান্টি দিন। সেবিকাদের কাছে তার প্রশ্ন, আমিতো মরতেই গিয়েছিলাম। কেন আমাকে বাঁচিয়ে তোললেন? আমি খাবো কিভাবে? আমাকেতো কেউ বিয়েও করবে না। তার কান্নারুদ্ধ ফরিয়াদ, আমি সেই নরপশুদের বিচার চাই। ওরা রেহাই পেলে আরও অনেক মেয়ের অবস্থা আমার মত হবে। তার প্রশ্ন, জন্ম ও বেঁচে থাকা কেন আমার জীবনের অভিশাপ হয়ে দেখা দিল?

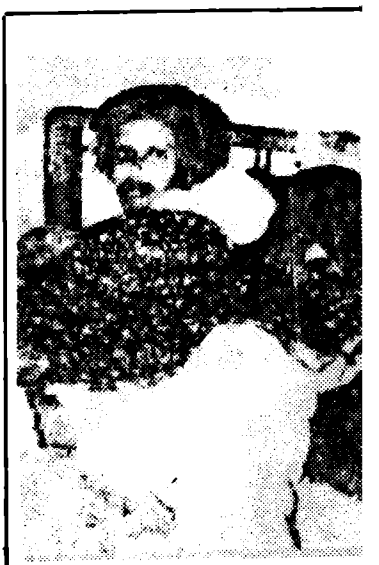

নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল, ধানমন্ডি থানা এবং একজন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে সে তার ওপর নির্মম নির্যাতনের কাহিনী বলেছে। সে জানিয়েছে, ধানমন্ডিতে ১৯ নম্বর রোডের এক বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করার সময় মালিকের ছেলে মোতালেব ও হারুন তার উপর অব্যাহত শারীরিক নির্যাতন চালায়। তারা দিনের পর দিন তাকে দৈহিক সম্পর্কে যেতে বাধ্য করে। প্রতিবাদ করলে জীবন নাশের হুমকি দিত। এসব ব্যাপারে সে বাড়ির মালিককে বিভিন্নভাবে জানিয়েছে। কিন্তু মালিক কোন ব্যবস্থা নেননি। একদিন মালিকের বড় ছেলে মোতালেব তাকে পাগলাবাজারে নিয়ে যায়। কাওসারি বেগম নামে এক মহিলার ঘরে রাখে। সেখানে মোতালেব এবং তাদের ফ্যাক্টরির কর্মচারী সোলেমান ড্রাইভার ও অজ্ঞাতনামা একজন তার ওপর নিয়মিত চড়াও হতে থাকে। এক পর্যায়ে তারা এসব দৈহিক নির্যাতনের দৃশ্যের ভিডিও রেকর্ড করতে শুরু করে। তাদের কাছে মনি জানতে চায়, এসব কি করছেন আপনারা? দয়া করে আমাকে মুক্তি দিন।

www.pathagar.com

মোতালেবের দলবল জানায়, তোকে আমরা বিয়ে দেবো। তারপর তারা চলে যায়। অনেক দিন আসে না। একদিন মোতালেব এসে জোরপূর্বক দৈহিক ক্ষুধা মিটিয়ে চলে যায়। মনি জানায়, কাওসারি বেগমের ওই ঘরে থাকার সময় অনেক চিৎকার করেছি। কেউ এগিয়ে আসেনি। একদিন আমি অনেক কষ্টে সেখান থেকে পালিয়ে আসি। ঘৃণা ও লজ্জায় আত্মহত্যা করতে ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দেই।

স্থানীয় লোকজন আহত মনিকে পংগু হাসপাতালে নিয়ে আসে। একটা হাত ও একটা পা কেটে ফেলতে হয়। হাসপাতালে দীর্ঘদিন চিকিৎসা করে চিকিৎসকরা তাকে কিছুটা নিরাময় করে তোলেন। এখন সে আশংকামুক্ত।

একজন মহিলা সরকারী অফিসার বললেন, পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চ থেকে মেয়েটি ছুটির দরখাস্ত করেছিল। তা মঞ্জুর হয়নি। এখন আমাদের দিকে সে ঘৃণা, অবিশ্বাস ও দুঃসহ যন্ত্রণা নিয়ে তাকিয়ে রয়েছে। আমাদের কি কিছুই করার নেই?

ইতোমধ্যেই থানা পুলিশ হয়েছে। নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেলের কাছে এলে ঘটনাটি ফৌজদারি নৃশংস অপরাধ বলে থানার এখতিয়ারে দেয়া হয়। ধানমিন্ড থানা হারুণকে গ্রেফতার করেছে। মোতালেব পলাতক। মামলা দায়েরও হয়েছে। নির্যাতনকারীদের বাকিরা পলাতক। অপরাধীচক্র বিত্তবান ও প্রভাবশালী। তারা নানাভাবে মামলার মোড় ঘুরিয়ে দিতে তৎপরতা চালাচ্ছে। পুলিশের একটি সূত্র মতে, পংগু মনির কাছে নানারকম লোকের আনাগোনা। এরা গরীব এই মেয়েটির পিতামাতাকে প্রভাবিত করতে তৎপর। নানা প্রলোভন তারা দেখাচ্ছে।

পংগু হাসাপাতালে সরেজমিন পরিদর্শনকালে দেখা গেছে, অচেনা কিছু লোক মনির কাছে ঔষুধ খাবার টাকা পয়সা পৌঁছে দিচ্ছে। মনির মা এদের চেনেন না। হাসপাতালের মনির বেডের কাছে এক যুবককে পাওয়া গেল। ঔষুধপত্র, কলা ও আপেল নিয়ে সে এসেছে। তার সাথে কথোপকথন এরূপ ঃ

ঃ এই মেয়েটি আপনার কে হয়?

ঃ কেউ না। একে আমি চিনি না।

ঃ মেয়েটিকে না চিনেই ঔষুধ ফলমূল নিয়ে এলেন?

ঃ লোকটি বিরক্ত হয়ে বললেন, আমি আনিনি। পেছনের ওই সাহেব এনেছেন।

ঃ ভাই আপনার নাম?

ঃ নামের কোন দরকার নেই।

বেশ পেছনে হাসপাতালের লবিতে এক সুঠামদেহী যুবক দাঁড়িয়ে। প্রথমোক্ত যুবক একেই নির্দেশ করেছে। তার কাছে প্রশ্ন, ওই মেয়েটিকে আপনি চেনেন? কি হয়েছে ওই মেয়েটির?

www.pathagar.com

উত্তর ঃ আমি এ ব্যাপারে কিছু জানিনা। আমি আরেকজনের সাথে এসেছি।

অনেক খোঁজাখুঁজি করেও ওই তৃতীয় 'আরেকজন' লোকের সন্ধান মেলেনি।

এক পর্যায়ে জানা গেল, মনি যে বাড়িতে কাজ করতো, প্রথমোক্ত ব্যক্তিটি সেখানকার গাড়ীর চালক। জিজ্ঞাসা করলে উত্তেজিতভাবে সে তা স্বীকার করলো। প্রতি ংক ঃ মিলন ফারাবী- বাংলাবাজার পত্রিকা- ৫/১১/৯৩।

এবার পাঠকগণ চিন্তা করে দেখুন, আমরা কোন্ সমাজে বাস করছি। আধুনিক বর্বরতা যে কত ভয়ংকর, কিশোরী মনি এর সাক্ষী। দুর্বলের কাছে আইন খুবই কড়া, কিন্তু সবলের কাছে আইন যেন লজ্জাবতী লতা। প্রাচীনকালের ক্রীতদাসীদের জীবনেও সতীত্ব ও সম্ভ্রমের নিরাপত্তা এভাবে বিঘ্নিত হতোনা, কিন্তু একালের কোন কোন চাকরানী সেকালের ক্রীতদাসীর চেয়েও নির্যাতিতা এবং লাঞ্ছিতা। কিশোরী মনির দৃষ্টান্ত কি তা প্রমাণ করেনা?

www.pathagar.com

আয়েশার অপরাধ ঃ হ্যানির গোপন ব্যাপার জানে

১৯৯০ সালের ১৩ই অক্টোবরের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত খবর ছিল এই ঃ গৃহ পরিচারিকা নির্যাতনের অভিযোগে বাংলাদেশ বিমানের সিনিয়র ক্যাপ্টেন আনোয়ারুল আজিমের স্ত্রী বেগম জায়েদা আজিম, ছেলে মুরাদ ও মেয়ে সালমা হ্যানিকে ১২ই অক্টোবর (১৯৯০) শুক্রবার গুলশান থানার পুলিশ গ্রেফতার করে। ১২ই অক্টোবর তাদের ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে হাজির করা হয়। কোলে শিশু সন্তান থাকায় আদালত হ্যানিকে জামিনে মুক্তি দেয়। অভিযোগে জানা যায়, গৃহ পরিচারিকা আয়েশা বেগম (২৮) ও তার স্বামী গাড়ী চালক মোহাম্মদ আক্কাস (৩২) প্রায় দু'মাস ধরে ক্যাপ্টেন আজিমের বারিধারাস্থ বাসভবনে কাজ করে আসছে। আক্কাসই ঐ বাসায় প্রথমে গাড়ী চালকের চাকরী নিয়ে সপরিবারে বসবাস করতে থাকে। এরপর বেগম আজিমের অনুরোধে সে তার স্ত্রীকে ঐ বাসায় গৃহ পরিচারিকার কাজের অনুমতি দেয়। দিন কয়েক আগে আয়েশা বেগম ক্যাপ্টেন আজিমের কন্যা হ্যানির একটা গোপন ব্যাপার জেনে ফেলায় সে ঐ পরিবারের আক্রোশের শিকার হয়। এরপর গত বৃহস্পতিবার (১১/১০/৯০) শারীরিক অসুস্থতার কারণে বিবি সাহেবার কথা মত কাজ করতে না পারায় তার ওপর নেমে আসে অমানুষিক নির্যাতন। আয়েশা অভিযোগ করে, সামান্য বিদেশী দেয়াশলাইর অজুহাতে তাকে প্রথমে বেগম আজিজ নির্মমভাবে প্রহার করেন। এরপর তার ছেলে মুরাদ ও কন্যা হ্যানি তাকে এলোপাতাড়ি লাথি ও ঘুষি মারে। এক পর্যায়ে আয়েশা বেহুশ হয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়লে তার ওপরে প্রথমে কেটলি ভরা ঈষৎ উষ্ণ পানি, পরে গরম

গৃহ পরিচারিকা আয়েশা

www.pathagar.com

খুন্তি দিয়ে তার হাতে এবং উরুতে ছেঁকা দেয়া হয়। স্ত্রীর মুমূর্ষু অবস্থা দেখে স্বামী আক্কাস এগিয়ে এলে ক্যাপ্টেন আজিমের কন্যা হ্যানি তাকে পিস্তল উচিয়ে গুলী করার হুমকি দেয়। এরপর প্রচন্ড মারধরের পর দু' জনকে বাড়ী থেকে বের করে দেয়া হয়। সুবিচারের আশায় আয়েশা বেগম ও তার স্বামী বাংলাদেশ দন্ডবিধির ৩২৬ ধারায় একটি মামলা দায়ের করে (মামলা নং ১৬ তারিখ ১১-১০-৯০)। শুক্রবার সকালে পুলিশ আসামীদের বারিধারার বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে এবং বিকেলে কোর্টে চালান দেয়।

উল্লেখ্য, ক্যাপ্টেন আজিমের কন্যা হ্যানি টিভি-রেডিওর কোরআন শিক্ষার আসরের পরিচালক প্রখ্যাত ক্বারী হাবিবুল্লাহ বেলালীর প্রাক্তন স্ত্রী। বছর দুয়েক আগে হ্যানি বেলালীর বিরুদ্ধে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনসহ বিভিন্ন অভিযোগ এনে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা দায়ের করে দেশব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

এই হ্যানি যে কোন্ চরিত্রের মহিলা, তা পাঠকদের বুঝতে বোধহয় আর অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। এমন চরিত্রের মহিলা স্বামীকে নাকে রশি লাগিয়ে ঘুরায় আর চাকর চাকরানীদের ক্রীতদাস আর দাসী জ্ঞান করে তাদের ওপর নির্যাতন চালায়।

www.pathagar.com

চম্পা বিচার পেল মরণের পর

মর্মন্তুদ ও নৃশংস ঘটনা। ১৯৮৯ সালের মে মাস। ঘটনাস্থল ঢাকার ৪৮/৩/১ রামকৃষ্ণ মিশন রোডের জনাব আবদুল্লাহ মামুনের বাসা। এ বাসায় কাজ করতো ১০ বছরের মেয়ে চম্পা। গৃহকর্ত্রী রুবিনা মামুন পিতলের খুন্তি ও বাঁশের লাঠি দিয়ে চম্পাকে হত্যা করেন। সে ১৯৮৯ সালের ১২ই মে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যায়। পিতলের যে খুন্তি ও বাঁশের লাঠি দিয়ে চম্পাকে হত্যা করা হয়, তদন্তকারী পুলিশ অফিসার মামলার আলামত হিসাবে সেই দুটি হাতিয়ার উদ্ধার করেন। গৃহকর্ত্রী রুবিনা মামুনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ দন্ডবিধি ৩০৪ ধারায় চার্জসীট দেয়া হয়। চার্জসীটে তদন্তকারী অফিসার শাহ আলম দীর্ঘ ১৯ দিন তদন্ত নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। এসময় তিনি পাড়া পড়শী, প্রত্যক্ষদর্শী এবং হতভাগ্য চম্পার মা বাবা সহ ২০ জনেরও বেশী লোকের সাক্ষ্য নেন। এদের সাক্ষ্য নেয়ার পর তদন্তকারী অফিসার নিশ্চিত হন যে, মাত্র একশত টাকা চুরি করার অভিযোগে চম্পাকে ঘরে বন্দী করে মারধর করা হয়। পিতলের খুন্তি গরম করে তার শরীরে ছেঁকা দেয়া হয়। এক পর্যায়ে লাঠি দিয়ে পিটাতে পিটাতে তার হাঁড় ভেঙ্গে দেয়া হয়। এর ফলে চম্পা অজ্ঞান হয়ে পড়ে। তখন অবস্থা বেগতিক দেখে নিষ্ঠুর গৃহকর্ত্রী ও গৃহস্বামী যুক্তি করে চম্পাকে চিকিৎসার্থে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করেন। হাসপাতালে তারা চম্পার ডাইরিয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করেন, কিন্তু চম্পার অবস্থা এবং চম্পার গৃহস্বামী আবদুল্লাহ মামুন ও গৃহকর্ত্রী রুবিনা মামুনের কথাবার্তায় সন্দেহ হওয়ায় ডিউটিরত ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাটা পুলিশকে জানান। পুলিশ খবর পেয়ে চম্পা হত্যার অভিযোগে এই স্বামী-স্ত্রীকে গ্রেফতার করে।

চম্পার আসল বাড়ি ফরিদপুরে। হতভাগ্য চম্পার মা থেকেও নেই। বাবা থাকতেও সে পরিচয় দিতে পারেনা। মা অন্যত্র বিয়ে করেছে। বাবাও বিয়ে করেছে অন্য একস্থানে। ফলে অসহায় এই চম্পা স্রেফ দুমুঠো ভাতের আশায় ফরিদপুর থেকে ঢাকায় এসে এই হতভাগিনী মামুন-রুবিনার বাসায় কাজ নেয়, কিন্তু নিয়তির নির্মম পরিহাস, পেটের দায়ে কাজ করতে এসে দু' বেলা দু' মুঠো অন্ন যোগাতে গিয়ে অকালে চম্পা তার প্রাণ হারায়।

চাঞ্চল্যকর গৃহপরিচারিকা চম্পা হত্যা মামলার বিচার হয় ঢাকার চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে। পুলিশ এই হত্যার অভিযোগে মামুন ও তার স্ত্রী রুবিনাকে গ্রেফতার করে এক মাসের ডিটেনশনে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক রাখে। মামলায় এই দম্পতির

www.pathagar.com

জেল হয় বলে জানা যায়। কিন্তু শিশু চম্পা অনেক আগেই এ দুনিয়া থেকে চিরবিদায় নেয়। বলুনতো, চম্পার জীবন চাকরানীর না ক্রীতদাসীর?

১৪ই মে (১৯৮৯) বিভিন্ন দৈনিকে চম্পা হত্যার যে বিবরণ প্রকাশিত হয়, তার কিছু অংশ এখানে পেশ করছি।

ঈদের ৪/৫ দিন আগ থেকে ঈদের ২/৩ দিন পর পর্যন্তও চম্পাকে বেদম মারপিট করা হয়েছে। সর্বশেষ তাকে মারপিট করা হয় ১১ই মে বৃহস্পতিবার।রুবিনা মামুন স্বীকার করেছে যে, সে চম্পাকে বেত ও খুন্তি দিয়ে মারপিট করতো। মাঝে-মধ্যে খুন্তি গরম করেও তার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ছেঁকা দেয়া হয়েছে। রুবিনা মামুনের বক্তব্য, চম্পা চুরি করতো এবং তার কথা শুনত না বলেই এসব নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা নেয়া হতো। দু' সন্তানের জননী রুবিনা মামুন পুলিশের কাছে প্রদত্ত জবানবন্দিতে আরো বলেছে, সে ভাবতে পারেনি যে, মারপিটের কারণেই চম্পার মৃত্যু হবে।

রুবিনা মামুনের স্বামী আবদুল্লাহ মামুন পুলিশের কাছে প্রদত্ত জবানবন্দিতে স্বীকার করেছে যে, তার স্ত্রী চম্পাকে মারপিট করতো। কিন্তু সে নিজে চম্পাকে মারপিট করেনি। শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাত ও মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত কারণে চম্পার মৃত্যু হয়েছে। চম্পার মৃতদেহের ময়না তদন্তের দায়িত্বে নিয়োজিত ডাক্তারের ধারণাও তাই। ময়না তদন্তের পর চম্পার মৃতদেহ তার পিতার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। আবদুল্লাহ মামুনরাই চম্পার অসুস্থতার কথা বলে তার পিতাকে ঢাকায় আনিয়েছিল। ফরিদপুরের জাহাঙ্গীরের মেয়ে চম্পাকে আবদুল্লাহ মামুনের শাশুড়ী প্রায় ৩ বছর আগে মেয়ের বাসায় কাজ করতে পাঠিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

সীমার চিৎকারকে তলিয়ে দেয়া হত মিউজিক ক্যাসেট বাজিয়ে

পৈশাচিক উল্লাস। ১৯৯২ সালের ৫ই ডিসেম্বর একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত ঘটনা, যে ঘটনার পৈশাচিকতার বর্ণনা দেয়ার মত ভাষা আমার জানা নেই। ঘটনার শুরু ১৯৮৯ সালের ১লা জুলাই থেকে । এর সমাপ্তি ঘটে ১৯৯২ সালের ডিসেম্বর মাসে। ঘটনাটির মূল চরিত্র সীমা নামের এক কিশোরী। এই কিশোরীকে নির্যাতন করে কাঁদানো হতো। সে যখন আক্রান্ত হয়ে চিৎকার করতো, তখন মিউজিক ক্যাসেট ফুল ভল্যুমে বাজিয়ে গৃহকর্ত্রী উল্লাস করতেন। একদিকে সীমার বুক-ফাটা চিৎকার ও অপরদিকে মিউজিক। রীতিমত কম্পিটিশন।

যারা কথায় কথায় 'মধ্যযুগীয় বর্বরতা' বলে ইসলামের যুগকে গালি দেয়, তারা নিশ্চয়ই সীমার নির্যাতন কাহিনী পাঠ করে লজ্জায় মাথা নত করে বলবে, আধুনিক বর্বরতাই সবচেয়ে বেশী ভয়ংকর। কারণ, মধ্য যুগে নির্যাতনের এই বিচিত্র টেকনিক মানুষের জানাও ছিলনা। আমাদের মত আধুনিক সভ্যরা এই আধুনিক যুগে ক্ষুর ব্লেড চালনা থেকে শুরু করে আণবিক পারমাণবিক বর্বরতা পর্যন্ত রপ্ত করে নিয়েছি। আমাদের বর্বরতায় মিউজিকও যুগ হয়েছে। সংক্ষেপে শুনুন সে কাহিনী।

বরিশালের আগৈলঝাড়া থানার আঙ্কর গ্রামের দরিদ্র ঘরের মেয়ে সীমা। বাবা তিলক বিশ্বাস একজন গৃহ শিক্ষক। ৫ সন্তানের মুখে অন্ন তুলে দিতে তার ভীষণ কষ্ট হতো। এরপর স্থানীয় জনৈক শশধর হাজরা ১-৭-৮৯ তারিখে সীমাকে কাজ দেবে বলে তার ভাইজির বাড়ি ঢাকায় নিয়ে যায়। ঢাকা থেকে সীমাকে নেয়া হয় ১৫ হিলভিউ, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রামে। সেখানে চার্টার্ড একাউন্টেন্ট গোমেজের স্ত্রী শোভা গোমেজের হাতে তুলে দেয়া হয় সীমাকে।

www.pathagar.com

এরপর কেটে যায় ৩৯ মাস। দরিদ্র পিতার ইচ্ছা থাকলেও পয়সার অভাবে দেখতে পারেন নি সীমাকে। এই ৩৯ মাস সীমার উপর দিয়ে কি কি ঝড়-তুফান বয়ে যায়, তা জানতে পারেননি তার মা বাপ। পরে অবশ্য জানা যায় যে, সীমার ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালাতেন শোভা গোমেজ। প্রতিদিন নির্যাতন করা শোভার নেশায় পরিণত হয়ে যায়। অসহায় সীমাকে হতে হয় তার নির্যাতনের শিকার। তার সারা শরীরে ক্ষতের চিহ্ন। হাতের ১০টি আংগুল ইট দিয়ে পিটিয়ে ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে। গরম খুন্তি দিয়ে খুচিয়ে সামনের মাড়ির দুটি দাঁত ভেঙ্গে ফেলা হয়। কথায় কথায় বেদম মারধর করা হতো। যখন যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতো সীমা, তার চিৎকার যাতে বাহির থেকে কেউ শুনতে না পায়, সেজন্য খুব জোরে ডেক সেটে ইংরেজী গানের মিউজিক ছাড়া হতো।

অবশেষে অত্যন্ত অমানুষিক অবস্থায় সীমাকে উদ্ধার করে বরিশালে আনা হয়। সে এখন দাঁড়াতে পারেনা। পারে না বসতে। কথা বললে কথা জড়িয়ে যায়। সারাক্ষণ মায়ের কোলে পড়ে থাকে। এ ব্যাপারে আগৈলঝাড়া থানায় একটি জিডি করা হয়েছে।

তারপর সীমার কি হলো, সে বাঁচলো না মরলো, তা জেনে সমাজের কি কোন লাভ আছে? লাভ নেই। সমাজে যদি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে মানবিকতার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়ে সক্রিয় থাকতো, তাহলে সীমার হাতের দশ আংগুল ইট দিয়ে শীল-পাটায় হলুদের মত ছেঁচা আর খুনতি দিয়ে সীমার সামনের দুটি দাঁত ভেংগে ফেলার এবং তার নির্যাতনের চিৎকার চাপা দেয়ার জন্য মিউজিক ক্যাসেট বাজানোর বিচার অবশ্যই হতো, দোষীরা শাস্তি পেত, কিন্তু সমাজ হয়েছে এমন, কার গোয়ালে কে দেয় ধোঁয়া। শোভা গোমেজদের উৎকট ক্রুর উল্লাসের মিউজিক তাইতো কখনো বন্ধ হয়না।

www.pathagar.com

দুঃসংবাদ কণিকা — ১৯৯০

[বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদের হুবহু পরিবেশন]

আনিয়া ঃ (খুলনা, ২৩শে জুন, শনিবার, ১৯৯০ ঃ দৈনিক খবর) গতকাল মহানগরীর মুন্সীপাড়ার জনৈক অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তার বাড়ীর কাজের মেয়ে ষোড়শী আনিয়ার (১৬) মৃত্যু নিয়ে নানা জল্পনা কল্পনা শুরু হয়েছে। গৃহকর্ত্রী বলছেন, আনিয়া ছাদ থেকে পড়ে মারা গেছে। প্রতিবেশীরা বলছেন, ঐ দিন তারা ছাদ থেকে মানুষ পড়ার মত কোন শব্দ শোনেননি। মৃত আনিয়ার শরীরে যেসব আলামত লক্ষ্য করা গেছে, তাতে উপর্যুপরি ধর্ষণ করার ফলেই তার মৃত্যু হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। আনিয়ার ডাক্তারী পরীক্ষার রিপোর্ট প্রভাবান্বিত করার জন্য একটি প্রভাবশালী মহল চেষ্টা চালাচ্ছে বলে শোনা গেছে।

এদিকে মাগুরা থেকে আনিয়ার পিতা মোকসেদ আলী আজ খুলনায় এসেছেন। তার মৃত্যু রহস্য ধামাচাপা দেয়ার জন্য তার ওপর চাপ বিভিন্নভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

বিলকিস ঃ (১৩ই জুলাই, শুক্রবার, ১৯৯০ সাল ঃ দৈনিক বাংলার বাণী) গৃহপরিচারিকা বিলকিস বেগমকে বেদম প্রহার করে তিন দিন ঘরে আটকিয়ে রাখার খবর পাওয়া গেছে। বিলকিসের অপরাধ, আলু ভাজতে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলেছিল আলু। বিলকিসের বাড়ি মাদারীপুরের জাকরাবাজা গ্রামে। বাবা নূরুল ইসলাম বয়াতি এবং মা সুফিয়া খাতুন। অভাবের তাড়নায় বিলকিস মায়ের সাথে কাজের জন্যে শহরে এসেছিল। ৯ই জুলাই সোমবার (১৯৯০) বিলকিস ৩১ উত্তর ধানমন্ডি কলাবাগান (১ম তলা) এক ভাড়াটের বাসায় কাজ শুরু করে। ঐ দিনই সে গৃহকর্ত্রীর নির্দেশে আলু ভাজতে যায়। আলু ভাজার সময় কিছুটা আলু পুড়িয়ে ফেলে। এই অপরাধে গৃহকর্ত্রী বিলকিসকে প্রহার শুরু করেন। এর পর গৃহকর্ত্রীর স্বামীও তাকে প্রহার করেন। দু'জনের বেদম প্রহারে বিলকিসের চোখ মুখ ফেটে যায়। প্রহারের পর বিলকিসকে একটি ঘরে আটকে রাখা হয়। ওরা বিলকিসকে মায়ের সাথে

www.pathagar.com

যোগাযোগ করতে দেননি। পরে তার মায়ের চিৎকারে পাড়ার লোকজন এগিয়ে আসে এবং বিলকিসকে উদ্ধার করে। এরপর বিলকিস বাংলাদেশ মহিলা সমিতির কাছে সাহায্যের জন্যে আবেদন জানায়।

সুচিত্রা ঃ (ময়মনসিংহ, ১১ই জুলাই, বুধবার, ১৯৯০ঃ দৈনিক ইনকিলাব) আজ ভোর ৪টায় ময়মনসিংহ শহরের শাখারী পট্টির বীরেন্দ্র চন্দ্র পন্ডিতের বাসার বাথরুম থেকে সুচিত্রা (৩০) নামে উক্ত বাসার গৃহপরিচারিকার লাশ উদ্ধার করা হয়। গৃহকর্তা জানান, সুচিত্রা গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করে। অন্যদিকে প্রতিবেশীরা জানান, তাকে সুপরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। লাশ ময়না তদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়।

মেঘনা ঃ (২৮শে সেপ্টেম্বর, শুক্রবার, ১৯৯০ঃ দৈনিক জনতা) গৃহকর্ত্রীর হাতে সাত বছরের কাজের মেয়ে 'মেঘনা' নির্যাতনের শিকার হয়েছে। তার সমস্ত শরীরে রয়েছে নির্যাতনের চিহ্ন। গৃহকর্ত্রীর হাত থেকে মেয়েটিকে উদ্ধার করে এক ব্যক্তির হেফাজতে দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে মিরপুর থানায় ২৭শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার জিডি করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মিরপুর ১২ নম্বর সেকশনের সি-ব্লকের ৩ নম্বর রোডের ৪০ নম্বর বাসার মালিক গোলাপ আহমদের বাসায় মেঘনা কাজ করতো। দেড়মাস আগে নওগাঁর শ্রীরামপুর এলাকা থেকে মেঘনাকে আনা হয়। তার মাতাপিতা মারা গেছে। সে অন্যের আশ্রয়ে থাকতো। গোলাপ সাহেবের স্ত্রী মিসেস নাজমা বেগম শিশু মেঘনাকে বিভিন্ন কারণে মারধর করতেন। দুপুরে মেঘনা ভাত খেতে কেন বিলম্ব করলো এই অজুহাতে গৃহকর্ত্রী নাজমা বেগম তাকে মারধর করেন। তার মাথায় বটি দিয়ে আঘাত করে জখম করেন, পাতিল গরম করে শরীরে ছেঁকা দেন, লাঠি ও রুটি বানানোর বেলুন দিয়েও মারধর করেন। মেঘনার মাথায় তিনটি সেলাই দিতে হয়েছে। মেঘনার চিৎকারে পার্শ্ববর্তী বাসার আলতাফ হোসেন মোল্লা নামের এক ব্যক্তি এসে তাকে উদ্ধার করেন। পরে উক্ত ব্যক্তি মেঘনাকে মিরপুর থানায় নিয়ে যান। সেখানে থানার পক্ষ থেকে মেঘনার বক্তব্য গ্রহণ করে জিডি করা হয়। পুলিশ জানায়, মেঘনার কোন অভিভাবক না থাকায় উদ্ধারকারী ব্যক্তির হেফাজতে তাকে দেয়া হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে আশ্বাস দেয়া হয়।

রানু বেগমঃ (৫ই অক্টোবর, শুক্রবার, ১৯৯০ঃ বাংলার বাণী) গত বুধবার রাতে গুলশানের ৩৪ পিসি কালচার হাউজিং সোসাইটির বাড়ির কাজের মেয়ে রানু বেগমের (২৮) রহস্যজনকভাবে মৃত্যু ঘটে। এ ব্যাপারে অস্বাভাবিক মৃত্যুর অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়। মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়। রানু বেগমের গ্রামের বাড়ি বরিশালের মেহেদীগঞ্জ উপজেলার লালগঞ্জ গ্রামে। বাড়ির মালিক ইয়াসিন ইকবালসহ পরিবারের লোকজন বাড়িতে তালা দিয়ে বাইরে বেড়াতে যান। সন্ধ্যায় ফিরে রানু বেগমকে

www.pathagar.com

ফ্যানের সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায় বলে পুলিশের কাছে অভিযোগ করা হয়েছে।

হাসিনাঃ (নীলফামারী, ৬ই অক্টোবর, শনিবার, ১৯৯০ঃ ইনকিলাব) কাজের মেয়ে হাসিনার ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। নীলফামারী সদর উপজেলার ইটাখোলা ইউনিয়নের সিংদই গ্রামের মরহুম আব্দুল মামুদের মেয়ে হাসিনা। মায়ের অভাবী সংসারের কারণে কাজ নেয় সৈয়দপুর বিসিক সম্প্রসারণ কর্মকর্তা কাজী মেহেদী হাসানের বাড়িতে। তার বাড়ি রংপুর শহরের সিও বাজারে। মেহেদী হাসানের স্ত্রী আফসানা বেগমও রংপুর বিসিক অফিসে চাকুরীরত। মেহেদী হাসান জনৈক আবু বকরের সহযোগীতায় হাসিনাকে জুলাই মাসের শেষের দিকে রংপুরে নিয়ে যান। ছোট মেয়ে হাসিনা কাজ করতে ভুল করলে তাকে বেদম প্রহার করা হতো। সময় মতো খাবার না দেয়া এবং কম পরিমাণ খাবার দেয়ায় হাসিনা অসুস্থ হয়ে পড়ে। অসুস্থ অবস্থায় তাকে কাজ করতে হয়েছে। তাকে বাড়ি আসতে দেয়া হত না। হাসিনার মায়ের অনুরোধে ইটাখোলা ইউনিয়ন

পরিষদের মেম্বার শামসুল তখন মেহেদী হাসানের বাড়িতে যান এবং হাসিনার কথা শুনে সেদিনই তাকে নিয়ে আসেন। মেহেদী হাসানের শ্যালিকা তাকে বেশী প্রহার করেছে বলে অভিযোগ প্রকাশ। প্রতিবেশী যাতে তার কান্না শুনতে না পারে, সেজন্য জন্য তাকে বাথরুমে আটকে রাখা হতো। জামা তুলে শরীরের প্রহারের দাগগুলো সে দেখায়। হাসিনা নিষ্ঠুর নির্যাতনের কথা বর্ণনা করে হৃদয়বিদারী কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

একটি কাজের ছেলেঃ (১৮ই অক্টোবর, বৃহস্পতিবার, ১৯৯০ ঃ দৈনিক মিল্লাত) ১৭ই অক্টোবর চট্টগ্রাম রেলওয়ে পলো গ্রাউন্ড ময়দান এলাকায় ১০ বছরের একটি বাসার কাজের ছেলেকে (নাম অজ্ঞাত) পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

বাসার মালিক সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী নুরুল আমিন সকাল ৯টায় অফিসে চলে যাবার পর তার বাসার কাজের ছেলে মারা যায়। প্রতিবেশীরা জানায়, নুরুল আমিনের ছেলেরা কাজের ছেলেটিকে বেদম প্রহার করলে তার মৃত্যু ঘটে। কোতায়ালী পুলিশ ময়না তদন্তের রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত এ হত্যাকান্ড সম্পর্কে কোন মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছে।

রোকেয়া খাতুনঃ (যশোর, ২০শে অক্টোবর, শনিবার, ১৯৯০ঃ দৈনিক সংগ্রাম) গতকাল যশোর শহরের পূর্ব বানান্দি পাড়ার একটি বাড়িতে কাজের মেয়েকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। কোতায়ালী পুলিশ আজ সকালে তার ময়না তদন্ত শেষে এ তথ্য জানায়।

জানা গেছে, কাজের মেয়ে রোকেয়া খাতুনের (১২) লাশ গলায় উড়না পেচানো অবস্থায় বাড়ির উঠানে পাওয়া যায়। গৃহকর্তা গোলাম কিবরিয়ার বিরুদ্ধে ইতোপূর্বেও কাজের

www.pathagar.com

মেয়েকে নির্যাতন করার অভিযোগ রয়েছে। রোকেয়ার দেহের নানাস্থানে ক্ষতের চিহ্ন ছিল।

হতভাগিনী কিশোরীর বাড়ি সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলার মানপুরে। এ ব্যাপারে মামলা হয়েছে।

মরিয়মঃ (কুমিল্লা, ৯ই নভেম্বর, শুক্রবার, ১৯৯০ঃ বাংলার বাণী) একজন উর্ধতন সরকারী কর্মকর্তার গৃহপরিচারিকার রহস্যজনক মৃত্যুতে দীর্ঘ প্রায় ১৮ ঘন্টা লাশ হাসপাতালের বারান্দায় পড়ে থাকা এবং কবরস্থান থেকে পুলিশের লাশ উদ্ধারের ঘটনা শহরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। লাকসাম উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব হাবিবুর রহমানের বাস ভবনে মরিয়ম (১৯) নামে একে যুবতী দীর্ঘ দিন থেকে কাজ করছিল। গত ৬ই নভেম্বর মঙ্গলবার রাত দেড়টায় রহস্যজনকভাবে তার মৃত্যু ঘটে। নির্বাহী কর্মকর্তা নিজে রাতেই মরিয়মকে কুমিল্লা সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে ডাক্তার মরিয়মকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরে নির্বাহী কর্মকর্তা লাশটিকে হাসপাতালের বারান্দায় রেখে চলে আসেন। এ ব্যাপারে বিকেল ৬টার দিকে হাসপাতালে যোগাযোগ করলে আবাসিক ডাক্তারকে পাওয়া যায়নি। পরে হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে কর্মরত সিভিল সার্জনের সাথে যোগাযোগ করলে তিনি কিছুই জানেন না বলে জানান। পরে রাত ৯টার দিকে ইউএনও বাদী হয়ে কোতায়ালী থানায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা করলে পুলিশ জানতে পারে। এরই মাঝে কে বা কারা লাশটিকে পৌরসভার টমছমব্রীজস্থ কবরস্থানে নিয়ে যায়। পুলিশ খবর পেয়ে রাত ১১টায় লাশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে এবং গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টায় লাশটিকে ময়না তদন্তের জন্য মর্গে প্রেরণ করে। ময়না তদন্তের রিপোর্ট পাওয়া যায়নি। এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী অফিসার হাবিবুর রহমানের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হয়। তিনি বাসায় ছিলেন না। তার স্ত্রী অধ্যাপিকা সালমা হাবিব জানান, ইউএনও মৃত মরিয়মের দেশের বাড়ি ঢাকার নরসিংদিতে খবর দিতে গেছেন। এদিকে আজ সকালে টেলিফোনে লাকসামে ইউএনও'র সাথে যোগাযোগ করলে তিনি জানান, সেদিন আমি বেশি রাতে বাসায় ফিরে দেখতে পাই মরিয়ম বমি করছিল। সে পানি খেতে চায়, আমি তাকে পানি খাওয়াই। তবে মরিয়মের অবস্থা খারাপ দেখে কোন ডাক্তার না পেয়ে হাসপাতালে নিয়ে যাবার পর সেখানে মৃত বলে ডাক্তাররা ঘোষণা করেন। মরিয়মের বাড়ি নরসিংদি জেলার পলাশ উপজেলার চরসিন্দু গ্রামে।

রাত দেড়টা থেকে পরদিন রাত ৮টা পর্যন্ত কেনই বা লাশ হাসপাতালে পড়ে থাকে? তা ৎক্ষণিকভাবে কেনই বা পুলিশকে জানানো হলো না এবং পুলিশ যাবার পূর্বেই কেন লাশ হাসপাতাল থেকে কবরস্থানে নেয়া হলো ?এ ব্যাপারে জনমনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

তাহমিনাঃ (বরিশাল, ১০ নভেম্বর, শনিবার, ১৯৯০ ঃ ইনকিলাব) দশ বছরের শিশু তাহমিনা দু'পায়ে হাটতে চায়। ওর পা ঝলসে গেছে গৃহকর্তার নির্দেশ পালন করতে গিয়ে। বর্তমানে সে বরিশাল মেডিকেলের সার্জারী বিভাগে চিকিৎসাধীন । অর্থের জন্য ওর চিকিৎসা বোধহয় হবেই না। মোড়েলগঞ্জ থানার ফুলতা গ্রামের মেয়ে তাহমিনা পেটের দায়ে

www.pathagar.com

কাজ করতো রামপাল থানার মেঝ দারোগা (যিনি বর্তমানে খুলনা অথবা যশোরে) শাহজাহান শরীফের বাড়িতে। ঘরের কাজের এক পর্যায়ে গৃহকর্তার নির্দেশ পালন করতে চুলায় পড়ে গিয়ে ওর দু'পা ঝলসে যায়। এর পর তাকে দারোগা বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয় একটি মলম আর ৫ টি টাকা দিয়ে। পঙ্গুত্ব বরণ করে চলে চাঁদের মত ফুটফুটে এই শিশু। স্থানীয় হাসপাতালও দায়িত্ব এড়িয়ে যায়।

তাহমিনার পায়ের চামড়া যায় কুচকে। বাম পায়ের বুড়ো আঙ্গুল ছাড়া বাকি সব আংগুল বেঁকে উপরে উঠে আসে। পায়ের তলা হয়ে যায় মোটা। দেখা দেয় ইনফেকশন। বাম পায়ের কব্জিতে পচন ধরে যায়। এ অবস্থায় দারোগা শাহজাহান তাকে সাহয্যের বদলে তাড়িয়ে দেন। পরে তাহমিনা পা বাড়ায় বরিশালের পথে। পথে দেখা জনৈক স্বেচ্ছাসেবী মোহাম্মদ জসিম উদ্দীনের সাথে। তাঁর এবং বরিশাল জর্ডন রোড সমাজকল্যাণ পরিষদের সেক্রেটারী হুমায়ুন কবীরের সহায়তায় তাহমিনাকে ভর্তি করা হয় বরিশাল মেডিকেলে।

সাজেদা বেগমঃ (১৫ই ডিসেম্বর, শনিবার, ১৯৯০ঃ দৈনিক জনতা) সাজেদা বেগম (৩০) নামের একজন গৃহপরিচারিকা গত মঙ্গলবার রাতে ঢাকা মেডিকেলের কলেজ হাসপাতালে মারা গেছে। সে মহাখালীর ২০ নম্বর বাসায় কাজ করতো বলে জানা যায়। গত রোববার উক্ত বাড়িতে সাজেদা প্রহৃত হয়।

হাসপাতাল সূত্রে বলা হয়, দু'বছর আগে সাজেদা আজিমপুর ষ্টেট কলোনীর ৭৭/ডি নম্বর বাসায় কাজ করতো। গত ৯ই ডিসেম্বর আহত ও মুমূর্ষু অবস্থায় সে ঐ বাসায় এসে মানবিক সাহায্য প্রার্থনা করে। তখন সাজেদার অবস্থা খারাপ দেখে আগের গৃহকর্ত্রী মিসেস দেলোয়ারা বেগম তাকে হাসপাতালে ভর্তি করেন এবং পরে গত ১১ ডিসেম্বর উক্ত গৃহকর্ত্রী বিষয়টি জানিয়ে লালবাগ থানায় একটি জিডি এন্ট্রি করেন। বিষয়টি সম্পর্কে কলোনীর বাসিন্দারাও একই তথ্য জানিয়েছেন।

হতভাগ্য সাজেদার বাড়ি জামালপুর জেলার মেলান্দাহ উপজেলার কাপাহাটিয়া গ্রামে।

www.pathagar.com

দুঃসংবাদ কণিকা — ১৯৯১

[বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদের হুবহু পরিবেশন]

ফরিদা বেগম ঃ (৪ঠা মার্চ, সোমবার, ১৯৯১ ঃ দৈনিক জনতা।) গৃহকর্ত্রীর অমানুষিক নির্যাতনে গৃহপরিচারিকা কিশোরী ফরিদা বেগম মারাত্মকভাবে আহত হয়। তাকে মুমূর্ষু অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সে ইস্কাটনস্থ প্রপার্টি এনক্লেভের ১৮ তলা ভবনের ৮ম তলার ৮/৩ নম্বর বাসার কাজের মেয়ে। হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, শনিবার পবিত্র শবেবরাতের দিনে বাসায় ভাত রান্নায় বিলম্ব হলে গৃহকর্ত্রী নিলুফার বেগম তাকে বেদম প্রহার করে। এক পর্যায়ে গৃহকর্ত্রী রড ও ছেনি গরম করে তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে ছেঁকা দেয়। এরপর তাকে স্টোর রুমে আটক রাখে। গতকাল সে বন্দী অবস্থা থেকে পালিয়ে তার বোনের বাসায় যায়। তার বোন জ্যোৎস্না প্রথমে তাকে রমনা থানায় নিয়ে যায়। থানায় গৃহকর্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। পরে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। হাসপাতাল সূত্রে বলা হয়, ফরিদার অবস্থা আশংকাজনক।

সাহেরা খাতুন ঃ (৫ই এপ্রিল, শুক্রবার, ১৯৯১ ঃ দৈনিক জনতা) রাজধানীর পুরানা পল্টন এলাকার একটি বাসার কাজের মেয়ের রহস্যজনক মৃত্যু হয়। তার লাশ ময়না তদন্তের জন্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়। হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, ৪১/৩/বি পুরানা পল্টনস্থ মোহাম্মদ এমরান হোসেন খানের বাসার কাজের মেয়ে কিশোরী সাহেরা খাতুন ২রা এপ্রিল মঙ্গলবার রাতে কীটনাশক পান করে। তাকে ঐদিন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

বুধবার রাতে হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর কারণ জানা যায়নি। মতিঝিল থানায় এ ব্যাপারে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা দায়ের করা হয়েছে।

নাসিমা ঃ (১৫ই মে, বুধবার, ১৯৯১ ঃ দৈনিক মিল্লাত) সম্প্রতি ঝালকাঠি শহরের এক গৃহ পরিচারিকার ওপর নির্যাতনের ঘটনায় এলাকাবাসী স্তম্ভিত না হয়ে পারেনি।

www.pathagar.com

ঝালকাঠি জেলার মধ্যচাঁদকাঠি বস্তির নয়া মিয়ার মেয়ে নাসিমা (১২) আমতলা সড়কে "উম্মে জাকির ভিলা" দারোগা (অবঃ) মোফাজ্জেলের বাসায় দীর্ঘ দিন যাবৎ কাজ করত। একটি পারিবারিক ঘটনা ফাঁস করার সন্দেহে গৃহকর্ত্রী রড দিয়ে তাকে বেদম প্রহার করেন ও ব্লেড দিয়ে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঁচড় দেন। নাসিমার চিৎকারে লোকজন জড় হতে দেখে তার মুখ বেঁধে লোহা গরম করে তার পিঠ-বুকসহ সমস্ত শরীরে অসংখ্য ছেঁকা দিলে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। এই নির্যাতনের চিহ্ন প্রতিবেশীদের চোখ থেকে আড়াল করার জন্য তাকে একটি তালাবদ্ধ রুমে আটক রাখা হয়। রাতে ছেড়ে দেয়া হত কাজ করার জন্য। নাসিমার অসুস্থ শরীর নিয়ে কাজ না করতে পারলে গলা টিপে শ্বাস রুদ্ধ করে মেরে ফেলার ভয় দেখানো হতো। গৃহকর্ত্রীর নখের আঁচড়ে নাসিমার গলায় পচন ধরেছে।

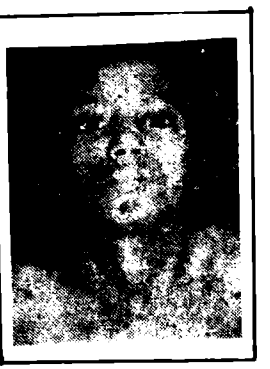

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নাসিমার মা মেয়েকে দেখতে চাইলে গৃহকর্ত্রী জানান, সে বেড়াতে গেছে। বাক বিতন্ডার এক পর্যায়ে তাকেও লাঠি দিয়ে বেদম প্রহার করলে স্থানীয় লোকজন ক্ষুব্ধ হয়ে নাসিমাকে তালাবদ্ধ বাথরুম থেকে উদ্ধার করে। নির্যাতনের ফলে নাসিমা কার্যক্ষমতা হারিয়েছে। এ ব্যাপারে ঝালকাঠি থানায় মামলা দায়ের হয়েছে।

জুলেখা ঃ (২৫শে এপ্রিল, বৃহস্পতিবার, ১৯৯১ ঃ দৈনিক জনতা) কাজের মেয়ে কিশোরী জুলেখা বেগমকে প্রহার করে হত্যা করা হয়। জুলেখার ময়না তদন্তকারী ডাক্তার প্রণব কুমার চক্রবর্তী তার ময়না তদন্ত রিপোর্টে এ কথা বলেছেন। ধানমন্ডি থানাধীন ২০/৫, লেক সার্কাস রোডের ইলিয়াস হায়দরের বাসার কাজের মেয়ে সে। শনিবার সন্ধ্যায় মারাত্মকভাবে আহত অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরী বিভাগে নেয়া হয়। হাসপাতালের ডাক্তার তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। গতকালই তার লাশের ময়না তদন্ত সম্পন্ন হয়। পেটে লাথি ও শরীরের কয়েক স্থানে আঘাতের ফলে তার মৃত্যু হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। ধানমন্ডি থানার সাথে যোগাযোগ করা হলে বলা হয়, এ ব্যাপারে কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। থানায় ময়না তদন্তের রিপোর্ট পৌঁছেনি।

হামিদা বেগম ঃ (২৭শে এপ্রিল, শনিবার, ১৯৯১ ঃ দৈনিক খবর) গৃহকর্ত্রীর অমানুষিক নির্যাতনে হামিদা বেগম (১৪) নামে একজন গৃহপরিচারিকা গুরুতর আহত হয়েছে। তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

জানা গেছে, মহাখালী ওয়ারলেস গেটের পূর্ব পাশে আলাউদ্দিনের বাড়িতে হামিদা প্রায় ৬ মাস যাবৎ পরিচারিকার কাজ করে আসছিল। মাসিক বেতন না দেয়ায় হামিদা ঈদের ছুটিতে মা-বাবার কাছে গিয়ে আর ফিরে আসেনি। গৃহকর্ত্রী মিনু আকতার গত মঙ্গলবার মহাখালী ওয়ারলেস গেট বস্তিতে নিয়ে হাজির হন। হামিদাকে বাসায় কাজ করার জন্যে বলপূর্বক নিয়ে আসেন। বাসায় এনেই হামিদার উপর শুরু করা হয় অমানুষিক নির্যাতন। গুরুতরভাবে আহত হয়ে পড়লে চতুর গৃহকর্ত্রী হামিদার মুখে 'এনড্রিন' ঢেলে দেন। এই

www.pathagar.com

অবস্থায় তাকে হলি ফ্যামিলী হাসপাতালে নেয়া হয়। দুদিন সেখানে চিকিৎসার পর কিছুটা সুস্থ হয়ে ওঠলে হামিদাকে বাপের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়। হামিদা বস্তিতে পৌছার পর তার অবস্থার অবনতি ঘটে। তাকে মুমূর্ষু অবস্থায় ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি করা হয়।

রাজিয়া ঃ (৯ই মে, বৃহস্পতিবার, ১৯৯১ ঃ দৈনিক খবর) গলাচিপা (পটুয়াখালী), ৮ই মে, ফিরনী চুরি করে খাওয়ার অপরাধে গৃহকর্ত্রী তার নাবালিকা পরিচারিকাকে গরম পানি দিয়ে নাক-মুখ পুড়িয়ে দিয়েছেন এবং অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছেন।

প্রকাশ, স্থানীয় বিদ্যুৎ দপ্তরের সহকারীর স্ত্রী আফরোজা নাহার রীকু (২৩) তার নাবালিকা গৃহ পরিচারিকা রাজিয়াকে (১০) নানা অজুহাতে দীর্ঘদিন যাবৎ বিভিন্ন ভাবে অমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে আসছিলেন। ঘটনার দিন রাজিয়া চুরি করে ফিরনী খেয়েছে এই অজুহাতে উক্ত আফরোজা নাহার ফুটন্ত পানি জোর করে তার নাক-মুখে ঢেলে দেন। এতে রাজিয়ার গাল ও ঠোঁট পুড়ে বীভৎস আকার ধারণ করে। এর পরদিন তাকে বিনা চিকিৎসায় নিজ বাসার দোতালায় আটকে রাখে। ঘটনার দু' দিন পরে গত ২৮শে মার্চ পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রাজিয়াকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে এবং চিকিৎসার জন্য উপজেলা হাসপাতালে পাঠায়।

উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা জানান, রাজিয়ার সারা শরীরে অমানুষিক নির্যাতনের চিহ্ন রয়েছে এবং সে মুখ দিয়ে কিছু খেতে পারছে না। তার হাতের আঙ্গুলও সাড়াশি দিয়ে চেপে দেয়া হয়েছে।

বসিরুন্নেছা ঃ (২৬শে সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার ঃ দৈনিক ভোরের কাগজ) গতকাল বুধবার সকালে ৩৫/এ, কলাবাগান লেক সার্কাসের একটি বাড়ীর গৃহ পরিচারিকা বছিরুন্নেসা (৩২)কে গৃহকর্ত্রী তিন তলা থেকে ফেলে দেন। তাকে গুরুতর অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার সারারাত গৃহকর্তা কাউয়ুম খান ও তার স্ত্রী তাকে শারীরিক নির্যাতন করেন বলে সে জানায়। শারীরিক অসুস্থতার কারণে কাজে অক্ষমতা প্রকাশ করলে তাকে ৩ তলা থেকে ফেলে দেয়া হয় বলে জানা গেছে। এ ব্যাপারে ধানমন্ডি থানায় কোন মামলা দায়ের করা হয়নি। কারণ, মামলা দায়ের করার মত তার কেউ নেই।

মাজেদা খাতুন ঃ (১লা অক্টোবর, মঙ্গলবার, ১৯৯১ ঃ দৈনিক ভোরের কাগজ) নারায়ণগঞ্জের ঘটনা। ঘটনার তারিখ ৩০শে সেপ্টেম্বর। একটি স্বর্ণের চেইনের জন্যে গৃহকর্ত্রীর নির্যাতনে প্রাণ হারালো গৃহ পরিচারিকা মাজেদা খাতুন (পিপড়ী) (২৫)। এ মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে এইদিন নারায়ণগঞ্জে কয়েকশ' বস্তিবাসী বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। শহর সংলগ্ন ফতুল্লার ইসদাইরে এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে। বস্তিবাসীর বিক্ষোভ প্রদর্শনের পর সবই যেন শেষ হয়ে গেল। মাজেদা খাতুন কবরস্ত হওয়ার পর তার গৃহকর্ত্রীর সব অপরাধও যেন মাটিচাপা পড়ে গেল।

www.pathagar.com

নাহার ঃ (নোয়াখালী, ৩রা অক্টোবর, বৃহস্পতিবার, ১৯৯১ ঃ দৈনিক রূপালী) গৃহকর্ত্রীর অমানবিক নির্যাতনের শিকার হয়ে ১২ বছরের কাজের মেয়ে নাহার সারা শরীরে নির্যাতনে ক্ষত-বিক্ষত চিহ্ন নিয়ে ন্যায়বিচারের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরছে।

নোয়াখালী বেগমগঞ্জ উপজেলার একলামপুর গ্রামের রিকশা চালক এমরান মিয়ার মেয়ে নূর নাহার, আর্থিক অসচ্ছলতায় এমরান দরিদ্র পরিবারের ভরণ-পোষণ মেটাতে না পেরে তার ১২ বছরের মেয়ে নূর নাহারকে আজ থেকে প্রায় ৩ মাস পূর্বে বাটা কোম্পানীর চট্টগ্রাম অঞ্চলের জনৈক কর্মকর্তার বাসভনে পাঠিয়ে ছিল। কিন্তু ভাগ্যের নিমর্ম পরিহাস, নূর নাহার দু'মুঠো অন্নের জন্য কাজ করতে এসে কথায় কথায় গৃহকত্রীর লোমহর্ষক নির্যাতনে অবশেষে প্রায় পঙ্গু অবস্থায় দেশের বাড়ীতে ফিরে এসেছে। নির্মম নির্যাতনের ফলে নাহার এখন হাঁটতে পারে না। নাহারের নানা হারিছ মিয়া সম্প্রতি তার আদুরে নাতনীকে নোয়াখালী প্রেস ক্লাবে নিয়ে এসে গৃহকর্ত্রীর অমানবিক নির্যাতনের বিবরণ দেন। তিনি কথা বলার সময় বার বার কেঁদে ফেলেন। বুকে পিঠে এখনও ক্ষতচিহ্ন ও তীব্র ব্যথা-বেদনায় কাতর নাহার মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না। সে জানে না গৃহকর্তার পুরো নাম কিংবা ঠিকানা। শুধু বলতে পারে চট্টগ্রাম কদমতলীতে একটি ৪ তলা ভবনের একটি ফ্লাটে সে কাজ করতো। সামান্য কারণে-অকারণে তার উপর চলতো রুটি তৈরীর বেলনার আঘাত, লাথি, কিল ও ঘুষি। প্রতিদিনের এমনি নির্যাতনে নির্যাতিত নাহার ন্যায়বিচার পাবে কিনা এ প্রশ্ন নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

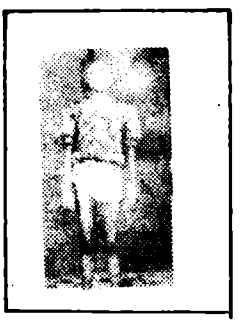

মেরী ঃ (৪ঠা অক্টোবর, শুক্রবার, ১৯৯১ ঃ দৈনিক সংবাদ) গত বুধবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে ৬২, চানখার পুল লেনের হাবিবুর রহমানের বাসার কাজের মেয়ে মেরীর (১৩) রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। মেরীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

বাড়ির লোকজন পুলিশকে জানিয়েছে, মেরী বাথরুমে ঝর্ণার সাথে ওড়না দিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে। পুলিশ তাদের বক্তব্য বিশ্বাস করতে পারছে না। মেরীর মৃত্যুরহস্য উদঘাটনের জন্য বাড়ির লোকজনকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়েছে। কোতোয়ালী থানা পুলিশ বলেছে, তার মৃত্যুর সঠিক কারণ নির্ণয় করতে ময়না তদন্তের জন্য মৃতুদেহ ঢাকা মেডিকেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ব্যাপারে কোতোয়ালী থানায় একটি ইউডি কেস দায়ের করা হয়েছে।

মিরাজ বেগম ঃ (১৩ই অক্টোবর, রোববার, ১৯৯১ ঃ দৈনিক বাংলা) নারায়ণগঞ্জ, ১২ই অক্টোবর। বন্দর উপজেলার চৌরাপাড়া গ্রামে মিরাজ বেগম (২৪) নামে এক গৃহপরিচারিকার অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। জোরপূর্বক গর্ভপাতকালে তার মৃত্যু হয় বলে জানা গেছে। সাত বছর আগে স্বামী পরিত্যক্তা মিরাজ একই গ্রামের আকবর প্রধানের বাড়িতে কাজ করতো।

www.pathagar.com

পুলিশ জানায়, গতকাল গভীর রাতে ৭ মাসের অন্তঃসত্ত্বা মিরাজকে গর্ভপাতের জন্য স্থানীয় একজন কবিরাজের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে গর্ভপাতকালে তার মৃত্যু হয়। পরে কে বা কারা তার লাশ মিরাজের বাড়িতে রেখে যায়। এ ব্যাপারে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

নাজমা খাতুন ঃ (**৫ই নভেম্বর, মঙ্গলবার, ১৯৯১ ঃ দৈনিক সংগ্রাম**) রাজধানীতে নাজমা খাতুন (১৭) নামের একজন গৃহ পরিচারিকার রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুটি হত্যা না আত্মহত্যা, তা জানা যায়নি। মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ নাজমার লাশ মোহাম্মদপুর কলোনীর ডি-২/এফ, ১৩/১৪ নং বাসার বাথরুম থেকে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় উদ্ধার করে।

মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ জানায়, গতকাল সকাল ৭টায় ঐ ফ্লাটের ভাড়াটিয়া হাবিবুর রহমানের ফোন পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় লাশ উদ্ধার করে। এ ব্যাপারে জনাব হাসান হায়দার থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা করেছেন। তবে ময়না তদন্ত রিপোর্ট না পাওয়ায় মৃত্যু-রহস্য জানা যায়নি।

জনাব হাসান হায়দার কর্তৃক দায়েরকৃত মামলায় বলা হয়, তার স্ত্রী শাহীদা পারভিন রীনা রাত আনুমানিক একটার দিকে বাথরুমে গিয়ে দরজা বন্ধ দেখতে পান। পরে ধাক্কা দিলে দরজাটি খুলে যায় এবং নাজমার লাশ ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। দরজা বালতিতে পানি ভর্তি করে চাপা দেয়া ছিল বলে উল্লেখ করা হয়। নাজমা সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ উপজেলার দমদমা গ্রামের ফজল মোল্লার মেয়ে। বাড়ির মালিক হাসান হায়দার পাবনার ফরিদপুর উপজেলার পুরন্দপুর গ্রামের মরহুম হাবিবুর রহমানের ছেলে।

আনা ঃ (**৩০শে নভেম্বর, শনিবার, ১৯৯১ ঃ দৈনিক বাংলার বাণী**) কাজের মেয়ে আনা (৯)কে মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ শ্যামলী রিং রোডস্থ ৪১ নম্বর বাসার জনৈক মাহবুবুল হকের বাসা থেকে রক্তাক্ত জখম অবস্থায় উদ্ধার করে।

থানা সূত্রে জানা গেছে, কাজের মেয়ে আনাকে গৃহকর্ত্রী সুইটি আটকে শারীরিক নির্যাতন চালান। এ ব্যাপারে বাসার অন্য গৃহপরিচারিকা রেহানা গৃহকর্ত্রীকে নির্যাতনের কাজে সহায়তা করতো। ২০/২৫দিন পূর্বে গৃহকর্ত্রী সুইটি ও রেহানা লোহার খুন্তি গরম করে আনার গুপ্ত অঙ্গে এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানে জখম করে। তারা লোহার রড ও লাঠি দিয়ে পিটিয়ে তার বাম পা মারাত্মকভাবে জখম করে। কাজের মেয়ের নির্যাতনের সংবাদ পেয়ে মোহাম্মদপুর থানার ওসি এন্তেজার রহমানের

www.pathagar.com

নেতৃত্বে মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ শ্যামলীস্থ বাসায় গিয়ে আনা নামে কাজের মেয়েটিকে রক্তাক্ত জখম অবস্থায় উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্যে হাসপাতালে পাঠায়।

আনার পিতার নাম নজরুল ইসলাম, গ্রাম চকরামপুর, থানা ত্রিশাল, জেলা ময়মনসিংহ বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। এ ব্যাপারে গত বৃহস্পতিবার উল্লেখিত আসামীদের বিরুদ্ধে মোহাম্মদপুর থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্তরা পলাতক বলে জানা গেছে।

নূর বানু ঃ (৩০শে নভেম্বর, শনিবার, ১৯৯১ ঃ দৈনিক বাংলার বাণী) কাজের মেয়ে নূরবানু জানায়, জনৈকা মহিলার সাথে সে দিনাজপুরের ইকবাল রোড থেকে ঢাকা আসে। ঢাকায় এসে নূরবানু কোন এক বাসায় কাজ নেয়। বাসার লোকজন তাকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করে। তাই সে বাসা থেকে পালিয়ে রাস্তায় কাঁদতে থাকে। এ অবস্থায় একজন রিকশাচালক গত ১০ নভেম্বর তাকে নিয়ে মোহাম্মদপুর থানায় যায় এবং একটি জিডি করে। মেয়েটি তার বাবার নাম আইয়ুব দারোগা ও মার নাম কুচিয়া বেগম বলে জানায়।

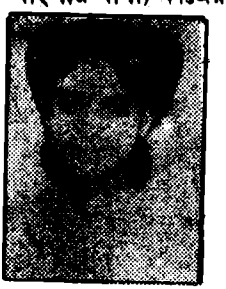

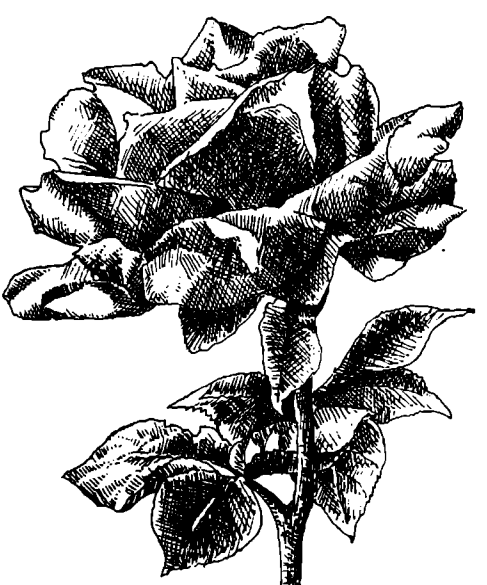

www.pathagar.com

দুঃসংবাদ কণিকা — ১৯৯২

[বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদের হুবহু পরিবেশন]

আমেনা ঃ (২৭শে জানুয়ারী, সোমবার, ১৯৯২ ঃ বাংলার বাণী) দশ বছরের কিশোরী আমেনা গৃহকর্তার নির্যাতনে পালিয়ে এসে জীবন রক্ষা করেছে। আমেনার ডাক নাম লিপি। বাড়ি সিরাজগঞ্জের শাহাজাদপুর থানার হাটপাঁচিল গ্রামে। বাবার নাম ঈমান আলী। সে জানায়, একমাত্র ভাইয়ের নাম নিজাম। বড় মামার নাম বাশি। মেঝ মামা হচ্ছে তোতা মিয়া। শাহাজাদপুর কৈজুরী বাজারের পাশে ওদের গ্রাম।

লিপি জানায়, একজন মহিলা অনেকে দিন আগে তাকে শাহাজাদপুর থেকে বেড়াবার নাম করে ট্রেনে চড়িয়ে ঢাকায় নিয়ে আসে। কমলাপুর স্টেশনে এসে ওই মহিলাকে লিপি হারিয়ে ফেলে। স্টেশন থেকে একজন লোক ওকে বাসায় কাজ দেয়ার নাম করে নিয়ে যায়। কতদিন ওই বাসায় মেয়েটি কাজ করেছে তা সে বলতে পারে না। ২৫শে জানুয়ারী, ১৯৯২ শনিবার রাতে গৃহকর্তা ওকে ফুঁসলিয়ে কাছে টানলে সে ভয়ে চিৎকার শুরু করে। গৃহকর্তা ওকে মারধর করে। গৃহকর্ত্রী কারণ জিজ্ঞাসা করলে লিপি কিছুই বলেনি। শনিবার ভোর রাতে বাসার সকলকে ঘুমন্ত অবস্থায় রেখে লিপি পালিয়ে আসে।

জাহেদা ঃ (১৩ই মার্চ, শুক্রবার, ১৯৯২ ঃ দৈনিক বাংলা) গৃহকর্ত্রীর অমানুষিক নির্যাতনের শিকার কাজের মেয়ে জাহেদা (১২)কে ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি করা হয়। নির্যাতনের ফলে তার শরীরে ফোসকা পড়ে এবং ক্ষতের সৃষ্টি হয়।

জাহেদা জানায়, এর চেয়েও মারাত্মক নির্যাতিত আরও ৪জন কাজের মেয়ে তার গৃহকর্তার বাসায় আটকা পড়ে আছে। গৃহকর্তার নাম মোশাররফ হোসেন। সে বিদেশী মালের ব্যবসা করে বলে জাহেদা জানায়। তার বাসা ধানমন্ডির ১৩৪/২

www.pathagar.com

সেন্ট্রাল রোডে। জাহেদা ৯ মাস যাবৎ এই বাসায় কাজ করছে। সানু (১২), হোসনে আরা (২৫), লাল বানু (১২) এবং একজন নতুন লোক ঐ বাসায় কাজ করে। গৃহকর্ত্রী এবং তার মেয়েরা তাদের উপর সব সময় নির্যাতন চালাতেন। তাদের দিয়ে সারাক্ষণ কাজ করিয়ে নিতেন এবং কখনও বাসায় যেতে দিতেন না। বাসায় যেতে চাইলেই ষ্টোর রুমে বন্ধ করে প্রহার করতো।

জাহেদা জানায়, বুধবার তার বাবা তাকে নিতে আসলে গৃহকর্ত্রী তার বাবার সাথে দেখা করতে দিতে অস্বীকৃতি জানান। এতে সে কান্নাকাটি করলে তার উপর এই নির্যাতন চালানো হয়। তাকে উত্তপ্ত রড এবং গরম পানির ছেঁকা দেয়া হয়। তার কান্নার আওয়াজ পেয়ে তার বাবা কাশেম আলী স্থানীয় একটি ছাত্রাবাসে গিয়ে ছাত্রদের কাছে এ ঘটনা জানান। তখন ছাত্ররা এসে তাকে উদ্ধার করে ধানমন্ডি থানায় নিয়ে যায়। অবশেষে রাত ১১টায় তাকে ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। জাহেদার বাবা বাদী হয়ে ধানমন্ডি থানায় একটি মামলা দায়ের করেন।

লিপি ঃ (১০ই এপ্রিল, শুক্রবার, ১৯৯২ ঃ দৈনিক রূপালী) কাজের মেয়ে লিপি তার বেগম সাহেবার গোপন ব্যাপার দেখে ফেলেছিল। এজন্যে বেগম সাহেবা লায়লা আর্জুমান্দ টুলু দিয়েছেন কঠিন সাজা। ফলে ৭ বছর বয়সী মেয়েটি এখন মরণাপন্ন।

৪৬, দক্ষিণ খিলগাঁওর বাসায় কাজ করে লিপি। প্রায়ই সে দেখতো যে, গৃহকর্তার অনুপস্থিতিতে কিছু লোক এ বাসায় এসে দরজা বন্ধ করে বিবি সাহেবার সাথে গল্প করতো। ঈদের দিনও গল্প করার জন্য কয়েকজন মেহমান আসেন। টুলু দরজা বন্ধ করে তার কামরায় মেহমানদের সঙ্গ দিচ্ছিলেন। টুলুর শিশুকন্যা জিনিয়াকে নিয়ে লিপি অন্য ঘরে খেলছিল। হঠাৎ সে বন্ধ দরজা খুলে ঢুকে পড়ে এবং গোপন ব্যাপার দেখে ফেলে। এতে প্রথমে অপ্রস্তুত এবং পরে ক্ষিপ্ত হন টুলু ও মেহমানরা। লিপির ওপর শুরু হয় বর্বরোচিত নিপীড়ন। আগুন দিয়ে ওর পিঠ ও শরীরের বিভিন্ন জায়গা ঝলসে দেয়া হয়। পিটিয়ে ভেংগে দেয়া হয় বাম হাত।

বেগম সাহেবা নির্যাতনের ঘটনা চেপে রাখতে চেষ্টা করেন। কিন্তু গোপন সূত্রে খবর পেয়ে যায় পুলিশ। মতিঝিল থানার এসআই রবিউল ইসলামের নেতৃত্বে একদল পুলিশ টুলু ও তার স্বামী শেখ কবীরকে গ্রেফতার করে।

লিপিকে হাসপাতালে ভর্তি করে দেয় পুলিশ। ওর বাড়ি বরিশালের ঝালকাঠিতে। গত এক বছর ধরে সে টুলুর বাসায় কাজ করছিল। বন্ধ দরজা খুলে কোনদিন সে টুলুর কামরায় ঢোকেনি। ঈদের রাতেই ঢুকলো এবং নিষ্ঠুর নির্যাতনে গুরুতরভাবে আহত হল।

চম্পা ঃ (১৩ই মে, বুধবার, ১৯৯২ ঃ দৈনিক সংবাদ) মাত্র পঁচিশ টাকার জন্যে চম্পা (১২) নামে একটি কাজের মেয়েকে তার গৃহকর্ত্রী মারধর করেছে এবং শরীরের বিভিন্ন

www.pathagar.com

জায়গায় জ্বলন্ত সিগারেটের আগুন দিয়ে ছেঁকা দিয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে ১৩ই মে মঙ্গলবার বিকেল চারটায় ধানমন্ডির নর্থ রোডের একটি বাড়িতে। জানা গেছে, ১২ই মে মঙ্গলবার তাকে সিগারেট কিনে আনবার জন্যে একশ' টাকা দিলে সে তা থেকে পচিশ টাকা হারিয়ে ফেলে। এর জের হিসেবে গৃহকর্ত্রী তাকে বেধড়ক মারধর করে এবং সিগারেটের ছেঁকা দেন।

নার্গিস ঃ (৯ই জুন, মঙ্গলবার, ১৯৯২ ঃ দৈনিক বাংলা) গৃহকর্ত্রীর উম্মত্ততার শিকার হয়ে প্রায় এগার বছরের একটি কাজের মেয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। নার্গিস নামের এই মেয়েটির শরীরের বিভিন্ন জায়গা তার গৃহকর্ত্রী গরম হাতা দিয়ে ঝলসে দিয়েছে। মাসখানেক আগে নরসিংদী থেকে এসে নার্গিস ঢাকার এক বাসায় গৃহপরিচারিকার কাজ নেয়। মহানগরীর কোন্ এলাকায় কার বাসায় ছিল, কিছুই সে বলতে পারে না। হাসপাতালের বেডে বসে শুধু এটুকুই সে বলতে পেরেছে, রোববার বিকালে গৃহকর্ত্রী তাকে ডাল ও গোশত রান্না করতে বলেছিল। সে রান্না করতে পারেনি বলে গৃহকর্ত্রী হাতা গরম করে তার শরীর ঝলসে দেন। দগদগে ক্ষত নিয়ে সোমবার সকালে রাস্তায় হাঁটাহাটি করার সময় একজন রিক্সাচালক তাকে নিয়ে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আসেন। একজন ফটো সাংবাদিক তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে দেন।

মিনা বেগম ঃ (৪ঠা আগষ্ট, মঙ্গলবার, ১৯৯২ ঃ দৈনিক ইত্তেফাক) গতকাল (সোমবার) বিকালে পুলিশ সেন্ট্রাল রোড এলাকার একটি বাসা থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় গৃহ পরিচারিকা মিনা বেগমের (১৬) লাশ উদ্ধার করে। তার মৃত্যুর কারণ জানা যায় নি। লাশ ময়না তদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে প্রেরণ করা হয়। ধানমন্ডি থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

রহিমা খাতুন ঃ (৭ই সেপ্টেম্বর, সোমবার, ১৯৯২ ঃ দৈনিক আল আমিন) (ঘটনা খুলনার)। একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তার কন্যার নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়ে গৃহপরিচারিকা রহিমা খাতুন (১৪) এখন হাসপাতালে পুলিশ পাহারায় চিকিৎসাধীন রয়েছে। বেঁচে থেকেও রহিমা যেন এক জীবন্ত লাশ। আটক রেখে শারীরিক নির্যাতন করে হত্যা চেষ্টার অভিযোগ এনে গৃহকর্তার কন্যা লোদনার বিরুদ্ধে খুলনা কোতয়ালী থানায় রহিমা নিজে বাদী হয়ে মামলা দায়ের করেছে।

দিনাজপুরের বীরগঞ্জের কাশিমনগর গ্রামের জলিল উদ্দিনের কন্যা রহিমা অর্থনৈতিক কারণে চাচার হাত ধরে খুলনা এসেছিল কাজের সন্ধানে ৬ মাস আগে।

www.pathagar.com

শরীফা ঃ (২১শে সেপ্টেম্বর, সোমবার, ১৯৯২ ঃ দৈনিক জনতা) টাকা চুরির অভিযোগে কাজের মেয়ে শরীফার উপর নির্মমভাবে শারীরিক নির্যাতন চালান হয়। লোহার রডের উপর্যুপুরি আঘাতে ক্ষত করা হয়েছে সর্বাঙ্গ। ছিদ্র করে দেয়া হয়েছে খাদ্যনালী। থেতলে দেয়া হয়েছে যৌনাঙ্গ। এই অমানবিক কান্ডটি ঘটেছে গত বৃহস্পতিবার বিকেলে বাগেরহাট শহরের পুরাতন বাজারের একটি বাড়িতে। মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে হাসপাতালে নেয়া হলেও তার বাঁচার আশা নেই বলে ডাক্তাররা জানিয়েছেন।

জানা যায়, বাগেরহাটের স্থানীয় বাসিন্দা কচুয়া উপজেলায় কর্মরত পেশকার আবদুল হান্নানের বাড়িতে ৬ মাস পূর্বে শরীফা কাজ শুরু করে। স্বামী পরিত্যক্ত এক সন্তানের জননী শরীফার পিতা একজন দিনমজুর। পিতার বোঝা কমাতেই পরের বাড়িতে ঝি-এর কাজ বেছে নেয়।

মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে বাগেরহাট হাসপাতালে ভর্তি করা হলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তার অবস্থা দেখে মৃত্যুকালীন জবানবন্দী নেয়ার ব্যবস্থা করেন। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দেয়া জবানবন্দীতে শরীফা জানিয়েছে, গৃহকর্তার স্ত্রী এবং প্রতিবেশী এক কলেজের অধ্যক্ষের স্ত্রী এই দুজনে মিলে তার উপর পশুর মত ঝাঁপিয়ে পড়ে নির্যাতন চালায়। শরীফার কোন আকুতি মিনতি তাদের হৃদয় স্পর্শ করেনি। অচেতন অবস্থায় শরীফার চিৎকারে অন্যান্য প্রতিবেশী ছুটে আসে। শরীফা জানায়, কি কারণে তার উপর এই নির্যাতন চালান হল, তা সে নিজেও জানে না।

সাজেদা ঃ (২১শে নভেম্বর, শনিবার, ১৯৯২ঃ দৈনিক সংবাদ) রাজধানীর অভিজাত এলাকা গুলশানের এক বাসার কাজের মেয়ে সাজেদা (১৯) নিজের সতীত্ব রক্ষা করতে গিয়ে গৃহকর্ত্রী মনোয়ারা বেগম ও তার মেয়ে ফারাহর বেদম মারপিটে গুরুতর আহত অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছে। লাঠির আঘাতে তার শরীরের বিভিন্ন জায়গা ক্ষতবিক্ষত। গত বৃহস্পতিবার ওই জঘণ্য ঘটনা ঘটেছে। গুলশান থানায় মামলা হয়েছে। গত শুক্রবার রাত ৯টা পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয়নি।

সাজেদা অভিযোগ করেছে যে, জীবিকা নির্বাহের জন্য ১০/১২ দিন আগে সে মনোয়ারা বেগমের বাসায় চাকরি নেয়। দু' একদিন পরই মনোয়ারা তাকে দিয়ে দেহ ব্যবসা করানোর জন্য চাপ দিতে থাকে, কিন্তু সে রাজী হয়নি। এরপর থেকে মনোয়ারা ও তার মেয়ে ফারাহ তাকে প্রায়ই মারপিট এবং নানারকম ভয়-ভীতি দেখিয়েছে। সাজেদা আরো অভিযোগ করেছে যে, গত বৃহস্পতিবার মনোয়ারা ও তার মেয়ে ফারাহ তাকে বেদম মারপিট করেছে। তাতেও সে দেহ ব্যবসার মত জঘণ্য কাজে রাজী হয়নি। তাকে একটি ঘরে আটকিয়ে রাখা হয়েছিল। সন্ধ্যার দিকে সে পালিয়ে এসেছে।

www.pathagar.com

সাজেদা অভিযোগ করেছে, আধুনিক বিরাট ওই বাসায় গাড়ি দিয়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরের বহু দামী লোকজন আসা যাওয়া করে। ওই বাসায় সুন্দরী যুবতী ও মহিলারা মজুদ থাকে। তারা মোটা টাকার বিনিময়ে ওই যুবতী ও মহিলাদের সাথে ফুর্তি করে চলে যায়। একটি সূত্রে জানা গেছে যে, উঁচু দরের নারী ব্যবসায়ে ফারাহর মা মনোয়ারা বেগমের বেশ নাম-ধাম আছে। মোটা অংকের বাড়ি ভাড়া নিয়ে তিনি দীর্ঘদিন থেকে নারী ব্যবসা চালিয়ে আসছেন।

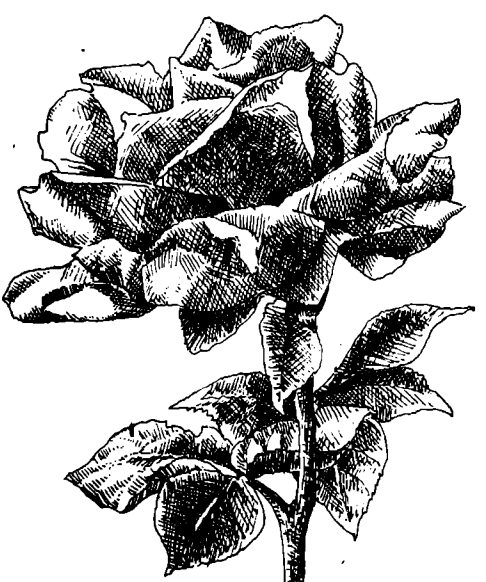

www.pathagar.com

দুঃসংবাদ কণিকা — ১৯৯৩

[বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদের হুবহু পরিবেশন]

বেগম ঃ (১৭ই জানুয়ারী রোববার, ১৯৯৩ ঃ দৈনিক বাংলা) শুক্রবার রাতে রাজধানীতে এক তরুণীর রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। বেগম (১৬) নামে উক্ত তরুণীর লাশ শনিবার ময়না তদন্তের জন্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। হাসপাতালের খবর ঃ বেগম ক্যান্টনমেন্ট থানাধীন ইব্রাহিমপুর গ্রামে এক ডাক্তারের বাসায় কাজ করতো। সে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে একথা বলে তার লাশ হাসপাতালে আনা হয়, কিন্তু তার মুখে বিষের কোন গন্ধ বা আলামত পাওয়া যায়নি।

পুলিশের ধারণা, বেগমকে হত্যা করে আত্মহত্যা বলে চালানো হয়েছে। রহস্য উদঘাটনের জন্য পুলিশ লাশটি ময়না তদন্তের জন্যে মর্গে পাঠায়। এ সম্পর্কে ক্যান্টনমেন্ট থানায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা দায়ের হয়েছে।

সখিনা ঃ (৩১ শে জানুয়ারী, রোববার, ১৯৯৩ ঃ দৈনিক ইত্তেফাক) সখিনার (১৮) রহস্যজনক মৃত্যুর পর পুলিশ গৃহকর্ত্রীসহ ৪ জনকে গ্রেফতার করে।

গতকাল শনিবার, খিলগাঁও তালতলার ৩৭১/বি নম্বর বাসার পিছনের সরু গলিতে কাজের মেয়ে সখিনার মৃতদেহ পড়ে থাকার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ উপস্থিত হয়। পুলিশ সখিনার গলায় কালো দাগ দেখতে পায়। তার মৃত্যু সম্পর্কে গৃহকর্ত্রী মমতাজ বেগমকে জিজ্ঞাসা করলে সে কিছুই জানেনা বলে জানায়। পরে পুলিশ মমতাজ বেগম, মোয়াজ্জেম, নাসিম ও জসিমউদ্দিনকে গ্রেফতার করে। সখিনার কোন নিকটজন নেই। পুলিশ বাদী হয়ে এই হত্যাকান্ডের মামলা করেছে।

রাবেয়া ঃ (৭ই জুন, সোমবার, ১৯৯৩ ঃ দৈনিক জনকণ্ঠ) গৃহকর্ত্রী রওশন বেগমের অমানুষিক নির্যাতন সইতে না পেরে ৭ বছরের কাজের মেয়ে রাবেয়া মারাত্মক জখম অবস্থায় বিচারপ্রার্থী হয়েছে। সবুজবাগ থানা পুলিশ রওশন বেগমকে গ্রেফতার করে গতকাল রোববার চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে পাঠায়। ম্যাজিস্ট্রেট সহিদউদ্দিন আহমদ তাঁর জামিন নামঞ্জুর করে তাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠান এবং নাবালিকা কাজের মেয়ে রাবেয়াকে নিরাপদ হেফাজতে সুচিকিৎসার আদেশ দেন।

www.pathagar.com

মুখে ভালমতো কথা না ফুটতেই অভাবের তাড়নায় রাবেয়াকে রাজধানীর সবুজবাগ থানার দক্ষিণ গোরান এলাকার রওশন বেগমের বাসায় কাজের মেয়ে হিসাবে নিয়োজিত হতে হয়। মাত্র ৫ বছর বয়সে পিতৃহীন রাবেয়ার মা তাকে এখানে কাজে দেয়। রাবেয়ার মা কাজ করে রওশন বেগমের চট্টগ্রামের মামা বাড়িতে। সেখানেই রওশন বেগমের সাথে তার যোগাযোগ হয়। রাবেয়ার বাড়ি কুমিল্লা জেলার লাঙ্গলকোট থানার জিনারা বড়বাড়ি গ্রামে। তার পিতার নাম অহিদ মিয়া। সবুজ বাগ থানা পুলিশের কাছে রাবেয়ার দেয়া বক্তব্যে জানা যায়, দু'বছর আগে রওশন বেগমের বাসায় কাজে আসার পর থেকেই খুব সামান্য খাবার দেয়া হতো। শুধু রাবেয়াকে ক্ষুধার যন্ত্রণাই নয়, তার ঘুম ভাঙতে দেরি হলে কখনো তাকে লাঠিপেটা করা হতো, কখনো গরম পানি ঢালা হতো। এ ছাড়া কাজের ত্রুটি হলে লাঠিপেটা করে অমানুষিক নির্যাতন করা হতো। সম্প্রতি গৃহকর্ত্রীর লাঠির আঘাতে তার মাথা ফেটে যায় এবং সর্বশেষ গত ৫ জুন ভাতের গরম কাঠি দিয়ে রাবেয়ার গলায় আঘাত করলে সে মারাত্মকভাবে জখম হয়। এ অবস্থায় প্রাণ ভয়ে পালিয়ে সে দক্ষিণ গোরান ক্লাবের সদস্যদের কাছে এ ঘটনা খুলে বলে। পরবর্তীতে ক্লাবের কর্মকর্তাগণ এ ব্যাপারে সবুজবাগ পুলিশের শরণাপন্ন হন। থানা পুলিশ রাবেয়ার বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে বাদী করে থানায় এক মামলা দায়ের করে এবং রওশন বেগমকে গ্রেফতার করে।

মানিক ঃ (৩রা জুলাই, শনিবার, ১৯৯৩ ঃ দৈনিক বাংলা) পেটের দায়ে বাসায় কাজ নিয়েছিল আট বছরের বালক মানিক। পায়জামা কাচতে না পারায় তার কপালে জুটেছে প্রচন্ড মারপিট। অমানবিক নির্যাতনের শিকার মানিক এখন ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন।

গত মঙ্গলবার এ ঘটনা ঘটেছে। হাসপাতালের আট নম্বর ওয়ার্ডের ডাক্তার জুলফিকার হাসান ভর্তি করে নেন মানিককে। ঘটনাটির পুলিশ কেস হয়নি। পুলিশ কেস না হওয়ারই কথা। কে করবে এ কেস? মানিকের আছেই বা কে এ সংসারে?

বেবী ঃ (২০ শে আগষ্ট, শুক্রবার, ১৯৯৩ ঃ দৈনিক বাংলা বাজার) মোহাম্মদপুরে বেবী নামে একজন গৃহপরিচারিকা আত্মহত্যা করেছে। ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল সকালে নূরজাহান রোডের ডব্লিউ ব্লকের ১৬ নং বাড়িতে। একজন এলাকাবাসী জানান, গতকাল সকাল ৯ টার দিকে গৃহকর্তা এস, এম, হারুন-উর-রশীদ এবং তার স্ত্রী সাগির-উন-নেসা নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে চলে গেলে বেবী (১৪) করিডরের ছাঁদের হুকের সাথে গলায় দড়ি পেচিয়ে ফাঁস নিয়ে আত্মহত্যা করে। সকাল সাড়ে ১০টার দিকে জরুরী কাজে গৃহকর্তা এস এম হারুন-উর-রশীদ বাড়িতে ফিরে এসে। বেশ কয়েকবার দরজার কড়া নাড়ার পরও ভেতর

www.pathagar.com

থেকে কারও সাড়া শব্দ না পেয়ে তিনি দরজার তালা খুলে নিজেই ভেতরে প্রবেশ করেন এবং বেবীকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। পরে পুলিশকে খবর দেয়া হলে পুলিশ এসে তার লাশ উদ্ধার করে এবং ময়না তদন্তের জন্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে প্রেরণ করে। বেবীর আত্মহত্যার প্রকৃত কারণ জানা যায়নি। তবে এলাকাবাসীর ধারণা তাকে হত্যা করাও হতে পারে। বেবী বেশ কিছুদিন যাবত ওই বাড়িতে কাজ করে আসছিল। গৃহকর্তা এস এম হারুন-উর-রশীদ বিসিকের সহকারী মহাব্যবস্থাপক এবং সাগীর-উন-নেসা টেলিফোন এবং টেলিগ্রাফ বোর্ডের একজন টেলিফোন অপারেটর।

সীমা ঃ (২৯ শে আগষ্ট, রবিবার, ১৯৯৩ঃ দৈনিক আল আমিন) পাঁচ বছরের কাজের মেয়ে সীমা এখন চুরির অভিযোগে শারীরিক নির্যাতন ও মামলার আসামী হয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে খুলনা শহরের খালিশপুরে। বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা খুলনা জেলা শাখার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানা গেছে, খুলনা কেন্দ্রের বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের সহকারী প্রকৌশলী মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলমের বাসায় শিশু সীমা কাজ করতো। এই অনাথ অপ্রাপ্ত বয়স্কা সীমা গৃহকর্তার মর্জি-মাফিক অকাতরে শ্রম দিয়ে আসছিল দীর্ঘদিন যাবত। কিন্তু তাতেও এই শিশুর প্রতি তাদের কোন সহানুভূতি জন্মায়নি। অবুঝ সীমা মুখ-বুজে সয়ে গেছে সব নির্যাতন। গৃহকর্তা ও গৃহকর্ত্রী অকারণেই তার উপর ছিল রুঢ়। এরই ধারাবহিকতায় গত এপ্রিল মাসে সীমার উপর নেমে আসে এক চরম দুর্ভোগ।

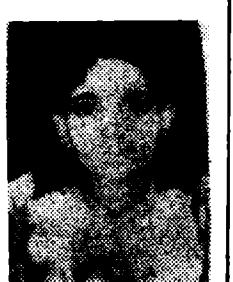

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গত ১৯শে এপ্রিল গৃহকর্ত্রীর কানের একটি রিং হারিয়ে গেলে তারা সীমাকে চোর সাব্যস্ত করে এবং রিংটি ফেরত চেয়ে তাকে অমানুষিকভাবে মারধর করে। সীমা রিং চুরির কথা বার বার অস্বীকার করলেও তারা তাতে কর্ণপাত করেননি বরং নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দেন। নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে সীমা উক্ত ইঞ্জিনীয়ারের বাসা থেকে পালিয়ে আসে। অজ পাড়াগাঁয়ের সীমা খুলনা শহরের পথঘাট কিছুই চেনে না। তাই অসহায়ভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাঁদতে থাকলে খালিশপুরের এক ঝাড়ুদার মোহাম্মদ আবদুর রবের চোখে পড়ে। পরে রব তাকে খালিশপুর থানায় পৌঁছে দেয়। থানা কর্তৃপক্ষ সবকথা শুনে সীমাকে তার বাড়িতে (নাটোরে) পৌঁছে দেয়।

নাটোর পৌঁছেও সীমা রক্ষা পায়নি। ইঞ্জিনীয়ার জাহাঙ্গীর ও তার পত্নী নাটোর গিয়ে আবার সীমার উপর নির্যাতন করে। অকথ্য নির্যাতনে সীমার বুকের পাজরের একটি হাড় ভেঙ্গে যায়। ঘটনা স্থানীয় লোকজনে জানতে পেরে সীমাকে স্থানীয় মানবাধিকার সংস্থায় নিয়ে যায়। ঘটনার বিস্তারিত জেনে নাটোর জেলা মানবাধিকার সংস্থা সীমাকে বাদী করে

www.pathagar.com

গত ২৬ জুলাই জাহাঙ্গীর আলম, তার স্ত্রীসহ চারজনের বিরুদ্ধে বাগাতীপাড়া থানা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে একটি মামলা দায়ের করে।

আকলিমাঃ (১৮ই সেপ্টেম্বর, শনিবার, ১৯৯৩ ঃ দৈনিক মিল্লাত) তেজগাঁও থানাধীন একটি বাসায় আকলিমা (১৩) নামে একজন কাজের মেয়ের রহস্যজনক মৃত্যু ঘটেছে। এ ব্যাপারে থানায় অপমৃত্যু মামলা হয়েছে। মৃত্যুর সঠিক কারণ নির্ণয় করতে ময়না তদন্তের জন্য লাশ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার সকাল ৬টায় খবর পেয়ে তেজগাও থানার পুলিশ ৬৩ নম্বর পূর্ব রাজাবাজার দ্বিতীয় তলার মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিনের বাসা থেকে আকলিমার লাশ উদ্ধার করে। আকলিমার গ্রামের বাড়ি আলেখারকান্দা, ভাঙ্গা থানাধীন ফরিদপুরে। আকলিমা ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে বলে গৃহকর্তা পুলিশকে জানিয়েছেন।

শেফালী ঃ (২৪ শে অক্টোবর, শনিবার ১৯৯৩ঃ দৈনিক বাংলা) পঙ্গু হাসপাতালের দোতলায় মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে শেফালী নামে কিশোরী। শেফালীর ডান হাত ও পা ভেঙ্গে গেছে। সে নাটোরে একজন উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বাসায় কাজ করতো। শেফালী জানায়, গত ১৫ অক্টোবর উক্ত ম্যাজিস্ট্রেটের স্ত্রী তাকে তিন তলার ছাদ থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। এরপর সে আর কিছুই জানেনা। স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসার পর ১৬ই অক্টোবর তাকে ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

শেফালী

হাসপাতালের বেডে মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর শেফালী ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে আগন্তুকদের দিকে। সে জানে না কি তার অপরাধ। বাড়ির বেগম সাহেবার কানের দুল হারিয়ে যাওয়ায় তিনি ক্ষিপ্ত হন এবং শেফালীকে সন্দেহ করেন। বেশ ক' দফা জেরাও করেছেন তিনি। এক পর্যায়ে রাগান্বিত হয়ে তিনি শেফালীকে তিন তলার ছাদ থেকে ফেলে দেন। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, তার অবস্থা আশংকাজনক।

হোসনে আরাঃ (২২শে নভেম্বর, রবিবার, ১৯৯৩ ঃ দৈনিক সংগ্রাম) গত শনিবার গভীর রাতে পুলিশ মগবাজারের ২০ নম্বর গ্রীনওয়ের বাসা থেকে কাজের মেয়ে হোসনে আরার (১২) লাশ উদ্ধার করেছে। বাথরুমের শাওয়ারের সাথে ওড়না পেচিয়ে ফাঁস লাগানোর ফলে তার মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে।

এ ব্যাপার গৃহকর্তা জনাব নাসির উদ্দিনের সাথে যোগাযোগ করে জানা যায়, ঘটনার দিন তিনি স্ত্রী-সন্তানসহ বিকেল ৫টায় বনানীতে দাঁতের ডাক্তারের কাছে যান। সেখান থেকে তারা গুলশান দু' নম্বরে কেনাকাটা শেষে রাত সাড়ে ৮ টায় বাসায় ফিরে দরজা বারবার নক করেন। কিন্তু ভেতর থেকে দরজা না খোলায় তারা ধাক্কাধাক্কি শুরু করেন। এ সময় প্রচন্ড শব্দে ওপর ও নীচ তলার লোকজন এসে জড়ো হয়। পরে পাশের দরজার চায়নিজ লক চাবি দিয়ে খুলে ধাক্কা-ধাক্কি করলে সিটকিনি খুলে যায়। আশপাশের লোকজনসহ জনাব

www.pathagar.com

নাসির ঘরে প্রবেশ করেন। উপস্থিত সবাই বাথরুমের শাওয়ারের সাথে ওড়না পেচানো অবস্থায় হোনেআরাকে ঝুলতে দেখতে পান। বেঁচে আছে সন্দেহে জনাব নাসিরের পিতা অন্যান্যের সহায়তায় তাকে নামান। জনাব নাসির ডাঃ ইকবাল হাসান মাহমুদকে ডেকে আনলে তিনি হোসনে আরাকে মৃত বলে ঘোষণা দেন। পুলিশ রাতে এসে তার লাশ নিয়ে যায়। এ সময় হোসনে আরার মা খিলগাঁও বস্তি থেকে মেয়েকে দেখতে আসেন। উল্লেখ্য, হোসনে আরার চাচাতো বোন একই বিল্ডিংয়ের নীচ তলায় কাজ করে। সন্ধ্যায় তার সাথে হোসনে আরার কথা হয় বলে জানা গেছে।

লাকিঃ (২৩ শে নভেম্বর, সোমবার, ১৯৯৩ঃ দৈনিক আল আমিন) ঢাকা মডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জনৈক ডাক্তারের বাসার কাজের মেয়ের রহস্যজনক মৃত্যু। মোহাম্মদপুর থানা এলাকার শ্যামলী রিং রোডে লাকি (৭) নামে একজন কাজের মেয়ের অকাল মৃত্যু ঘটেছে। এ ব্যাপারে লাকির গৃহকর্তা ডাঃ জাকির আহমদ জানান, সে দ্বিতল ভবনের ছাদ থেকে আকস্মিক পড়ে গিয়ে আহত হয়। আহত অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করার পর পরই মারা যায়। লাকির গালে পোড়া দাগ রয়েছে। তবে লাকির অকাল মৃত্যুর পেছনে রহস্য রয়েছে বলে থানা ও এলাকা সূত্র জানায়।

www.pathagar.com

মুর্শেদা থেকে লাকি

ক্রমিক নম্বর	নির্যাতনের নির্মম শিকার	যার হাতে নির্যাতিত/নিহত	কি ধরনের নির্যাতন	মন্তব্য
১	মুর্শেদা (নারী)	গৃহকর্ত্রী	গরম দুধ পিঠে ঢেলে দেয়া হয়	নারীর হাতে নারী নির্যাতন
২	নাসিমা (নারী)	গৃহকর্ত্রী	সারা অংগে লোহার রডের ছেঁকা	"
৩	হাফিজা (নারী)	গৃহকর্ত্রী	হত্যা	"
৪	শিল্পী (নারী)	গৃহকর্ত্রী	গরম খুন্তি দিয়ে ছেঁকা	"
৫	আছিয়া (নারী)	গৃহকর্ত্রী ও গৃহকর্তা	দেহদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে উভয়ে মিলে লোহার রড দিয়ে ছেঁকা দেন	" স্বামী শুধু সহযোগী
৬	শাহিনা (নারী)	গৃহকর্ত্রী	লোহার বেড়ি লাল করে বুকে পিঠে ছেঁকা	নারীর হাতে নারী নির্যাতন

www.pathagar.com

৭	রফিক (পুরুষ)	গৃহকর্ত্রী ও গৃহকর্তা	ফুটন্ত পানি পিঠে ঢেলে দেয়া হয় শুধু সহযোগী	স্ত্রীর ভূমিকা মূখ্য, স্বামী
৮	শেফালী (নারী)	গৃহকর্ত্রী	হত্যা	নারীর হাতে নারী নিধন
৯	হোসনেআরা (নারী)	গৃহকর্তা	বিষ খাইয়ে হত্যা	নরের হাতে নারী নিধন
১০	মুনীর (পুরুষ)	গৃহকর্ত্রী ও গৃহকর্তা	বাসা বন্দী	স্বামী স্ত্রীউভয়ই দায়ী
১১	ফিরোজা (নারী)	গৃহকর্ত্রী	প্রহার করা, কম খেতে দেয়া ও তলপেটে লাথি মেরে ফিরোজাকে হত্যা করা হয়	নারীর হাতে নারী নিধন
১২	মনি (নারী)	গৃহকর্তার ছেলে	যৌন ভোগের শিকার	নরের হাতে নারী নির্যাতন
১৩	আয়েশা (নারী)	গৃহকর্ত্রী ও তার মেয়ে হ্যানি	সব ধরনের নির্যাতন	নারীর হাতে নারী নির্যাতন
১৪	চম্পা (নারী)	গৃহকর্ত্রী	পিতলের খুনতি গরম করে শরীরে ছেঁকা অতঃপর মৃত্যু	নারীর হাতে নারী নিধন

www.pathagar.com

১৫	সীমা (নারী)	গৃহকর্ত্রী	গরম খুনতির ছেঁকা দেয়া হয়, দাঁত ভেংগে ফেলা হয়, বাজনার আওয়াজ দিয়ে ওর কান্না তলিয়ে দেয়া হতো।	নারীর হাতে নারী নির্যাতন
১৬	আনিয়া (নারী)	গৃহকর্ত্রী	ধর্ষণ জনিত কারণে মৃত্যু	নারীর হাতে নারী নিধন
১৭	বিলকিস (নারী)	গৃহকর্ত্রী	প্রহার	নারীর হাতে নারী নির্যাতন
১৮	সুচিত্রা (নারী)	গৃহকর্ত্রী	মৃত্যু রহস্যজনক ঃ আত্মহত্যা বা হত্যা	নারীর হাতে নারী নিধন
১৯	মেঘনা (নারী)	গৃহকর্ত্রী	মাথায় বটি দিয়ে আঘাত ঃ ছেঁকা, লাঠির আঘাত	নারীর হাতে নারী নির্যাতন
২০	রানু (নারী)	?	আত্মহত্যা ঃ রহস্য জনক মৃত্যু	?
২১	হাসিনা (নারী)	গৃহকর্ত্রী	প্রহার, খেতে কম দেয়া, অধিক কাজ আদায়	নারীর হাতে নারী নির্যাতন
২২	একটি কাজের ছেলে (নাম অজ্ঞাত)	গৃহকর্তার ছেলেরা	হত্যা	নরের হাতে নর নিধন

www.pathagar.com

২৩	রোকেয়া খাতুন (নারী)	গৃহকর্তা	পিটিয়ে হত্যা নারী নিধন	নরের হাতে
২৪	মরিয়ম (নারী)	গৃহকর্ত্রী	পিটিয়ে হত্যা	নারীর হাতে নারী নিধন
২৫	তাহমিনা (নারী)	গৃহকর্তা	দু' পা ঝলসে গেছে, মলম ও ৫টাকা দিয়ে বিদায়	নরের হাতে নারী নির্যাতন
২৬	সাজেদা (নারী)	গৃহকর্ত্রী	প্রহৃত হয়	নারীর হাতে নারী নির্যাতন, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন
২৭	ফরিদা (নারী)	গৃহকর্ত্রী	লোহা গরম করে ছেঁকা	নারীর হাতে নারী নির্যাতন
২৮	সাহেরা খাতুন (নারী)	?	রহস্যজনক মৃত্যুঃ কীটনাশক ঔষধ পান	?
২৯	নাসিমা (নারী)	গৃহকর্ত্রী	ছেঁকা	নারীর হাতে নারী নির্যাতন
৩০	জুলেখা (নারী)	গৃহকর্ত্রী	পেটে লাথি, শরীরে আঘাতঃ হত্যা করা হয়েছে	নারীর হাতে নারী নিধন
৩১	হামিদা	গৃহকর্ত্রী	নির্মম প্রহার	নারীর হাতে নারী নির্যাতন

www.pathagar.com

৩২	রাজিয়া (নারী)	গৃহকর্ত্রী	ফিরনী চুরি করে খাওয়ার অপরাধঃ গাল ও ঠোঁট পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে	নারীর হাতে নারী নির্যাতন
৩৩	বসিরুন্নেছা (নারী)	গৃহকর্ত্রী	তিন তলা থেকে ফেলে থেকে ফেলে দেয়া হয়, জীবন রক্ষা পায় তবে পঙ্গু হয়ে যায়	নারীর হাতে নারী নির্যাতন
৩৪	মাজেদা খাতুন (নারী)	গৃহকর্ত্রী	পিটিয়ে হত্যাঃ স্বর্ণের চেইন চুরির অভিযোগে প্রহার	নারীর হাতে নারী নির্যাতন
৩৫	নাহার (নারী)	গৃহকর্ত্রী	বেলনার আঘাত, কিল, ঘুষি	নারীর হাতে নারী নির্যাতন
৩৬	মেরী (নারী)	?	আত্মহত্যা	?
৩৭	মিরাজ বেগম (নারী)	গৃহকর্তা	সাত বছর আগের স্বামী পরিত্যক্ত মিরাজ বেগমকে গর্ভপাত করাতে গিয়ে হত্যা	নরের হাতে নারী নিধন
৩৮	নাজমা খাতুন (নারী)	?	আত্মহত্যা না হত্যাঃ মৃত্যু রহস্যজনক	?
৩৯	আনা (নারী)	গৃহকর্ত্রী	লোহার খুনতি গরম করের ছেঁকা	নারীর হাতে নারী নির্যাতন

www.pathagar.com

৪০	নুর বানু (নারী)	গৃহকর্ত্রী	শারীরিক নির্যাতন	"
৪১	আমেনা (নারী)	গৃহকর্তা	শারীরিক নির্যাতন নারী নির্যাতন	নরের হাতে
৪২	শাহেদা (নারী)	গৃহকর্ত্রী	শারীরিক নির্যাতন নারী নির্যাতন	নারীর হাতে
৪৩	লিপি (নারী)	গৃহকর্ত্রী	গৃহকর্ত্রীর গোপন কারবার দেখে ফেলার অপরাধে ছেঁকা	"
৪৪	চম্পা (নারী)	গৃহকর্ত্রী	ঝলন্ত সিগারেটের আগুন দিয়ে ছেঁকা	"
৪৫	নার্গিস (নারী)	গৃহকর্ত্রী	গরম হাতা দিয়ে দেহ ঝলসে দেয়া হয়েছে	নারীর হাতে নারী নির্যাতন
৪৬	মিনা বেগম (নারী)	?	আত্মহত্যা রহস্যজনক	?
৪৭	রহিমা খাতুন (নারী)	গৃহকর্ত্রীর কন্যা	শারীরিক নির্যাতন	নারীর হাতে নারী নির্যাতন
৪৮	শরীফা (নারী)	গৃহকর্ত্রী	নির্মম নির্যাতন	"
৪৯	সাজেদা (নারী)	গৃহকর্ত্রী	নির্মম নির্যাতন অপরাধঃ (পতিতা হতে অস্বীকৃতি)	"

www.pathagar.com

৫০	বেগম (নারী)	?	আত্মহত্যা	?
৫১	সখিনা (নারী)	গৃহকর্ত্রী	নির্যাতনের দ্বারা হত্যা	নারীর হাতে নারী নিধন
৫২	রাবেয়া (নারী)	গৃহকর্ত্রী	অমানুষিক নির্যাতন নারী নির্যাতন	নারীর হাতে
৫৩	মানিক (পুরুষ)	গৃহকর্ত্রী	অমানুষিক নির্যাতন (কাপড় কাচতে না পারার অপরাধে)	নারীর হাতে নর নির্যাতন
৫৪	বেবী (নারী)	?	আত্মহত্যা (রহস্যজনক)	?
৫৫	সীমা (নারী)	গৃহকর্ত্রী	শারীরিক নির্যাতন (কানের রিং চুরির অভিযোগ)	নারীর হাতে নারী নির্যাতন
৫৬	আকলিমা (নারী)	?	রহস্যজনক মৃত্যু	?
৫৭	শেফালী (নারী)	গৃহকর্ত্রী	তিন তলা থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়া হয়	নারী হাতে নারী নির্যাতন
৫৮	হোসনে আরা (নারী)	?	রহস্যজনক মৃত্যু	?
৫৯	লাকি (নারী)	?	রহস্যজনক মৃত্যু	?

www.pathagar.com

নুর্শেদা থেকে লাকি পর্যন্ত মোট ৫৯ জন চাকর চাকরানীর নির্যাতন কাহিনী এই পুস্তকে পেশ করলাম। প্রশ্ন উঠতে পারে ১৯৯০-৯৩ পর্যন্ত দেশে নির্যাতিত চাকর-চাকরানীর সংখ্যা কি মাত্র ৫৯? না, ৫৯ অবশ্যই নয়, সংখ্যাটি নিশ্চয় অনেক বড় হতে পারে। এই রাজধানী ঢাকাসহ গোটা বাংলাদেশে গত ৪ বছরে নির্যাতিত চাকর-চাকরানীর সংখ্যা কয়েক সহস্র হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। এ ধরনের ঘটনা যেখানে যত ঘটে, তার শতাংশের একাংশও প্রকাশ পায় না। কারণ, ঘটনার গোড়াতেই প্রচারের গোড়া কেটে দেয়া হয়। সুতরাং বলা যায়, সারা দেশে চাকর-চাকরানীদের উপর যত জুলুম নির্যাতন চলে, এর অতি ক্ষুদ্র এক ভগ্নাংশ মাত্র পত্র-পত্রিকায় বা অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে দেশবাসীর সামনে আসে। এছাড়া সবই লোকচক্ষুর অন্তরালে পড়ে থাকে। আমি এই পুস্তকে আমার সংগৃহীত শতাধিক ঘটনা থেকে মাত্র ৫৯টি ঘটনা তুলে ধরলাম। এই ৫৯ টি ঘটনার আয়নায় গোটা দেশের চাকর চাকরানীর অবস্থা অবলোকন করা যায়। এই ৫৯জন চাকর-চাকরানীর মধ্যে মাত্র ৪জন চাকর এবং ৫৫জন চাকরানী। লক্ষ্যণীয় দিকটি হচ্ছে এই, এই ৫৯টি ঘটনার মধ্যে ৫টি ঘটনা ঘটিয়েছেন ৫ জন গৃহকর্তা। দুই গৃহকর্তার ছেলেরা ঘটিয়েছে ২টি ঘটনা আর ৩টি ঘটনায় তিনজন গৃহকর্তা ছিলেন নিজ নিজ গৃহকর্ত্রীর সহযোগী হিসাবে। ৫২টি ঘটনার জন্য গৃহকর্ত্রী দায়ী। অর্থাৎ ৫২ জন গৃহকর্ত্রী ৫২টি ঘটনা ঘটিয়েছেন। এ ছাড়া আরও ৩টি ঘটনায় মূখ্য ভূমিকায় ছিলেন গৃহকর্ত্রী আর গৃহকর্তা ছিলেন শুধু সহযোগী। ৮জন চাকরানী খুন হয়েছে ৮ জন গৃহকর্ত্রীর দ্বারা। ২জন গৃহকর্তা খুন করেছেন ২জন চাকরানীকে। এই ২জন চাকরানীর সংগে কর্তাদের ছিল অবৈধ সম্পর্ক। অবৈধ সম্পর্কের বিষময় ফলকে চাপা দেয়ার জন্য ২জন গৃহকর্তা ২জন চাকরানীকে খুন করেছেন।

পাঠকগণ, ৫৯জন চাকর-চাকরানীর এই চার্ট দেখে নিজেরাই মন্তব্য করুন, প্রকৃতপক্ষে নারী নির্যাতনকারী কারা, নর না নারী? এই চাকরানীরা নারীকুলের সদস্যা আর তাদের ৮জন খুন হয়েছে গৃহকর্ত্রীদের দ্বারা। বাদ বাকি হয়েছে নির্মমভাবে নির্যাতিত। নারীর হাতে নারী নির্যাতনের এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে? আর একটি ব্যাপার লক্ষ্য করা গেছে যে, যেসব গৃহকর্ত্রী চাকর-চাকরানীদের নির্যাতন করেছেন, তাদের অনেকেই নারীবাদী আন্দোলনের নেত্রী ও কর্মী। নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে রাজপথে এদের অনেককে প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে শ্লোগান দিতে দেখা গেছে।

আত্মহত্যার যে ঘটনাগুলো উল্লেখ করা হয়েছে, সে সব ঘটনার মধ্যে অনেক রহস্য লুকিয়ে আছে। অনুমান করা যায়, অধিকাংশ আত্মহত্যা ঘটনার মূলে গৃহকর্ত্রীদের আচার-আচরণ এবং ব্যবহারই দায়ী ছিল। ইতি টানছি এখানে, তথ্য চার্টই যখন পাঠকদের সংগে কথা বলছে।

www.pathagar.com

মানবাধিকার কমিশনের জরিপ

মানবিক গুণাবলী ক্রমশই লোপ পাচ্ছে। নিজের ও পরিবারের সদস্যদের প্রতি গৃহকর্তা বা কর্ত্রী যে আচরণ করেন, সে ধরনের আচরণ গৃহপরিচারিকাদের ওপর তারা করছেন না। ৮ বছরের এতিম বালক কাজ করতে গিয়ে কোন অনিষ্ট করলে তার ওপর নেমে আসে ভয়াবহ নির্যাতন। এই মূল্যায়ন বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের। গৃহপরিচারিকাদের ওপর সাম্প্রতিক জরিপের পরিপ্রেক্ষিতে এই মূল্যায়ন করা হয়।

ঢাকার যাত্রাবাড়ি, গোপীবাগ, নারিন্দা, ধানমন্ডি, মোহাম্মদপুর এবং রূপগঞ্জে ১২৩ জন গৃহপরিচারিকার ওপর এই জরিপ চালানো হয়। এদের বয়স ৪ থেকে ৩০ বছর।

জরিপে লক্ষ্য করা হয়, এদের মধ্যে ১০৫ জনই এক বা একাধিকবার নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। ৪ থেকে ১৭ বছরের ৮৮ জন গৃহপরিচারিকার মা-বাবা নেই। কেউ কেউ সৎমায়ের সংসার থেকে এসেছেন। ১৭ বছরের বেশী বয়সের গৃহপরিচারিকাদের বেশীরভাগই স্বামী পরিত্যক্ত, বিধবা কিংবা স্বামী নিখোঁজ। নির্যাতনকারীদের শতকরা ৮০ ভাগ গৃহকর্ত্রী, শতকরা ১০ ভাগ নির্যাতন করেন গৃহকর্তা এবং বাকি ১০ ভাগ নির্যাতন করেন গৃহকর্তার আত্মীয়-স্বজন।

গোপীবাগ এলাকার ৫ বছরের এক শিশু গৃহপরিচারিকার শরীরের বিভিন্ন অংশে নির্যাতনের ক্ষতচিহ্ন লক্ষ্য করা যায়। খারাপ ও কম খাদ্য, ছেড়া পোশাক দেয়া হয়, অস্বাস্থ্যকর আবাসস্থলে থাকতে দিয়েও মানসিক নির্যাতন করা হয়। ধানমন্ডি আবাসিক এলাকায় জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে, এমন গৃহকর্ত্রীরা নির্যাতন করছেন, যারা বাইরে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন। এই অনুসন্ধানের সময় লক্ষ্য করা গেছে, প্রশাসনের বড় বড় কর্মকর্তার গৃহপরিচারিকারা তুলনামূলক বেশি নির্যাতনের শিকার। ৭২ জন গৃহপরিচারিকাকে গৃহকর্ত্রী বাইরে থেকে তালা দিয়ে বেড়াতে বা কাজে যান।

জাতিসংঘ মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের ৩, ৪ ও ৫ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, প্রত্যেকেরই জীবন ধারণ, স্বাধীনতা ও ব্যক্তি নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে। কাউকে দাস হিসেবে বা দাসত্বে রাখা চলবে না। সকল প্রকার দাস প্রথা ও দাস ব্যবসা নিষিদ্ধ থাকবে। কাউকে নির্যাতন অথবা নিষ্ঠুর অমানুষিক অথবা অবমাননাকর আচরণ অথবা শাস্তিভোগে বাধ্য করা চলবে না। ১৩ই অক্টোবর (১৯৯৩) বুধবার মানবাধিকার তথ্যানুসন্ধান রিপোর্টে বলা

www.pathagar.com

হয়ঃ গৃহপরিচারিকাদের ক্ষেত্রে ধারাগুলো না মেনে চরমভাবে মানবাধিকার লংঘন করা হচ্ছে।

তথ্য প্রদানকারী ১২৩ জন গৃহপরিচারিকার মধ্যে ৪০ জনই প্রাথমিক শিক্ষার আলো পায়নি। ৪২ জন যৎসামান্য শিক্ষার সুযোগ পেয়েছে। ৩১ জন ক্লাস সেভেন পর্যন্ত পড়েছে। ৮ জন ক্লাস নাইন পর্যন্ত। ২ জন এসএসসি পাস। ৭ জনকে গৃহকর্তা লেখাপড়ার সুযোগ করে দেন। দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকায় জরিপের এই ফলাফল প্রকাশিত হয় ১৪-১০-৯৩ তারিখে।

In 1950, the General Assembly decided that 10 December of each year should be observed Human Rigths Day all over the world.

Articles 1 and 2 of the Declaration state that "all human beings are born free and equal in dignity and rights" and are entitled to all the rights and freedoms set forth in the Declaration, "without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status".

Articles 3 to 21 of the Declaration set forth the civil and political rights to which all human beings are entitled, including:

_ the right to life, liberty and security of Person;

_ freedom from slavery and servitude;

_ freedom from torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;

_ the right to recongnition as a person before the law; equal protection of the law; the right to an effective judicial remedy; freedom from arbitrary arrest, detention or exile; the right to a fair trial and public hearing by an independent and impartial tribunal; the right to be presumed innocent until proved guilty;

www.pathagar.com

তাদের কথাই বলা হচ্ছে

সকাল থেকে গভীর রাত অবধি একটি পরিবারে যে নামটি সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত হয়, যার অভাবে সংসার অচল, সে হল কাজের বুয়া। সারাদিনের এত খাটাখাটুনির পরও এরা নানা ভাবে নিগৃহীত ও অত্যাচারিত। অনেক ক্ষেত্রে নিত্য মারধর ও দৈহিক নির্যাতন ভোগ করতে হয়। ক্ষেত্র বিশেষে মর্মান্তিক মৃত্যু অথবা আত্মহত্যা। এ যেন রাজধানী ঢাকার কাজের মেয়েদের বিধিলিপি।

ওদের অপরাধ? অন্তহীন। কাজে টিলেমী, কর্ত্রীর হুকুম ঠিক মত তালিম না করা, পছন্দমত কাজ না হওয়া, কর্তার ছেলে অথবা মেয়ের হুকুম তালিম না করা, কারো কারো ক্ষেত্রে মনোরঞ্জনে ব্যর্থ হওয়া ইত্যাদি। এসব কারণে শাস্তি ভোগ করতে হয় কাজের মেয়েকে। এধরনের ঘটনা ঘটছে রাজধানীর প্রায় প্রতিটি এলাকায়। তবুও ওরা মুখ বুঝে কাজ করে এক মুঠো অন্নের আশায়। দারিদ্র্যের কষাঘাতে ওরা যেন নির্জীব হয়ে গেছে। অব্যক্ত বেদনা নিয়ে ওরা শুধু কাজ করে যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটা লক্ষ্য করা গেলেও কিছু কিছু ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে।

অথচ ওদের ছাড়া ঢাকার কোন বাসাই প্রায় চলেনা। বাসাবাড়িতে কাজের মেয়ে অপরিহার্য। রান্না করা, কাপড় কাচা, বাসন ধোয়া, ঘর মোছা থেকে শুরু করে ছোট বাচ্চাদের দেখাশুনা, এমনকি তাদের স্কুলে পৌঁছিয়ে দেয়া এবং আনার দায়িত্ব কাজের মেয়েদের পালন করতে হয়। অথচ বিনিময়ে অনেক ক্ষেত্রে এদের ভাগ্যে জোটে নিপীড়ন আর অমানবিক আচরণ।

সকালে ঘুম থেকে ওঠে সবার আগে যার ডাক পড়বে, সে হলো কাজের বুয়া। এই বুয়া নাস্তা দাও, চা দাও, পানি দাও, এটা দাও, ওটা দাও, সেটা দাও ইত্যাদি। এই বুয়া কারো কাছে বেটি, কারো কাছে মাতারী, কারো কাছে খুকীর মা, কারো কাছে অমুকের মা, তমুকের মা ইত্যাদি। কেউ কেউ আবার আদর করে দাদী, নানী, পিসি, মাসি, খালাম্মা, দিদিমা, দিদি নামেও ডাকে। একটি পরিবারে সকাল থেকে গভীর রাত অবধি কাজের মেয়ের নাম যত বেশী উচ্চারিত হয়, অন্য কারো নাম তত বেশী উচ্চারিত হয় না। এর মূল কারণ কাজের মেয়ের সাহায্য ছাড়া সংসার চলে না। তাকে কোন না কোন কাজে ফাইফরমাস করতেই হয়। অথচ প্রতিনিয়ত যার উপস্থিতি অত্যন্ত প্রয়োজন তার কাজে এতটুকু গাফিলতি পেলে বকুনির শেষ নেই। সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত খেটে চলেছে, বিশ্রামের কোন অবকাশ নেই।

www.pathagar.com

এতো খাটা-খাটুনির পর কাজের মেয়ের বেতন কত জানেন? দিনরাত খাটুনির পরও অনেককে পেট ভরে খেতে দেয়া হয়না। দেয়া হয় না মাস শেষে বেতন। পেটে-ভাতে কাজ ঠিক করলেও অনেক কাজের মেয়েকে ভাতের পরিবর্তে দেয় হয় সারাদিনে একটা কি দুটো আটার রুটি। কাউকে কাউকে খেতে দেয়া হয় বাসার উচ্ছিষ্ট খাবার, যা পঁচা-বাসি বা খাবার অযোগ্য। অবশ্য সব বাসার কাজের মেয়ের সঙ্গেই এরূপ যে ব্যবহার করা হয়, তা নয়, অনেক বাসার খাবার-দাবার দেয়া হয় ঠিক মত। বেতনও দেয়া হয় মাস শেষে। অনেককে বেশ মোটা অঙ্কের বেতন দেয়া হয়।

তবে অনেক ক্ষেত্রেই মারধর আর নির্যাতন যেন এদের বাড়তি পাওনা। নির্যাতনেরও তো একটা সীমা থাকা উচিত। কেউ চুল ধরে টানাহেচড়া করছে, কেউ গায়ে গরম দুধ ঢেলে দিচ্ছে, কেউ কেউ শরীরে গরম শিক দিয়ে ছেঁকা দিচ্ছে। সারা শরীরে দ্যাগদ্যাগ ঘা, কোন কোন সময় গৃহকর্তার বা তার আত্মীয় স্বজনের লালশার শিকার হচ্ছে তারা। এরপরও ওরা অসহায় অবলার মত নীরবে সব সহ্য করে। সহ্য করতে না পারলে আত্মহত্যা করে অথবা সুযোগ পেলে কোথাও পালিয়ে যায়। অনেক সময় পালিয়েও রেহাই পায়না। এক হিসাবে জানা যায়, রাজধানী ঢাকা শহরে ১৬ থেকে ২০ হাজার কাজের মেয়ে রয়েছে। এদের মধ্যে ৩ থেকে ৪ হাজার ঠিকা ঝি। বাকিরা প্রায় স্থায়ীভাবে কাজ করে। এদের অধিকাংশই কোন না কোনভাবে নির্যাতিত হচ্ছে। ঠিকা কাজ যারা করে তারা সুযোগ পেলে সরে পড়ে। ফলে তাদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা কম। কিন্তু যেসব কাজের মেয়ে পরিবারে স্থায়ীভাবে থাকে, তাদের অধিকাংশের ভাগ্যে জোটে নির্যাতন।

পুলিশ সূত্রের খবর ঃ রাজধানী ঢাকা শহরে প্রতি বছর ৭০ থেকে ১০০ জন আত্মহত্যা করে। এরমধ্যে ১৫ থেকে ২০ জনই কাজের মেয়ে। এই সংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়ছে। অথচ এদের পরিচয় কেউ জানেনা। জানলেও এ নিয়ে তেমন লেখালেখি হয় না। এর মূল কারণ, যাদের অত্যাচারে কাজের মেয়েরা আত্মহননের পথ বেছে নেয়, তারা সমাজের প্রভাবশালী। তাদের ভয়ে কেউ কিছু বলতে চায় না। কিছু করাও সম্ভব হয় না। উপযুক্ত সাক্ষী ও বাদির অভাবে ইচ্ছা থাকলেও পুলিশ কিছু করতে পারে না।

একই অবস্থা নির্যাতিত কাজের মেয়েদের ক্ষেত্রেও। নির্যাতনের শিকার কাজের মেয়ের পাশে কে দাঁড়াবে? তার হয়ে কে কথা বলবে? তাই সে ভয়ে ভয়ে অসহায়ের মত সকল নির্যাতন সহ্য করে। কাউকে কিছু বলে না। অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে কাজ করে যায়। যথারীতি নীরবে কর্তা বা কর্ত্রীর ফাইফরমাইস করে ও শুনে।

এটাই যেন নিয়ম। এই নিয়মের ব্যত্যয় কি ঘটবে? এই জিজ্ঞাসা প্রতিটি কাজের মেয়ের।

সুনীল ব্যানার্জি ঃ দৈনিক বাংলা ১/৯/৯২ ।

www.pathagar.com

তাদের কথা আছে পাক কালামে

তোমরা মুশরিক নারীকে কখনও বিবাহ করবেনা, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ঈমান না আনবে। প্রকৃতপক্ষে একজন ঈমানদার ক্রীতদাসী হচ্ছে মুশরিক শরীফজাদী অপেক্ষাও অনেক ভাল, যদিও এই শেষোক্ত নারীকেই তোমরা অধিক পছন্দ করে থাক। (অনুরূপভাবে) নিজেদের কন্যাদের মুশরিক পুরুষদের সাথে বিয়ে দেবেনা, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। কারণ, একজন ঈমানদার ক্রীতদাস কোন উচ্চবংশীয় মুশরিক অপেক্ষা অনেক ভাল, যদিও এই ব্যক্তিকেই তারা অধিক পছন্দ করে থাকে। ২ ঃ ২ ঃ ২২১ ঃ আল কোরআন।

আর তোমরা সকলে আল্লাহর বন্দেগী কর, তাঁর সাথে কাউকেও শরীক করোনা, মাতাপিতার সংগে ভাল ব্যবহার কর, নিকটাত্মীয়, ইয়াতিম ও মিসকিনদের প্রতিও। প্রতিবেশী আত্মীয়ের প্রতি, আত্মীয় প্রতিবেশীর প্রতি, পাশাপাশি চলার সাথী ও পথিকের প্রতি এবং তোমাদের অধীনস্থ ক্রীতদাস ও দাসীদের প্রতি দয়ানুগ্রহ প্রদর্শন কর। নিশ্চিত জানিও, আল্লাহ্ এমন ব্যক্তিকে কখনও পছন্দ করেননা, যে নিজ ধারণায় অহংকারী ও নিজেকে বড় মনে করে গৌরবে বিভ্রান্ত। ৫ ঃ ৪ ঃ ৩৬ ঃ আল কোরআন।

নিজেদের বৈষয়িক স্বার্থের জন্য তোমাদের দাসীদের বেশ্যাবৃত্তি করতে বাধ্য করোনা, যখন তারা নিজেরা চরিত্রবতী থাকতে চায়। যে তাদের এজন্য জবরদস্তি করবে, আল্লাহ্ এ জবরদস্তির পর তাদের (দাসীদের) জন্য ক্ষমাশীল, দয়াময়। ১৮ ঃ ২৪ ঃ ৩৩ ঃ আল কোরআন।

নিশ্চয় আমি মানুষকে শ্রমনির্ভররূপে সৃষ্টি করেছি। সে কি মনে রাখে যে, তার উপর কেউ ক্ষমতাবান হবেনা? সে বলে, আমি প্রচুর ধন-সম্পদ ব্যয় করেছি। সে কি মনে করে যে, তাকে কেউ দেখেনি? আমি কি তাকে দেইনি চক্ষুদ্বয়, জিহবা ও ওষ্ঠদ্বয়? বস্তত; আমি তাকে দুটি পথ প্রদর্শন করেছি। অতঃপর সে ধর্মের ঘাঁটিতে প্রবেশ করেনি। আপনি জানেন, সে ঘাঁটি কি? তা হচ্ছে দাস-মুক্তি অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে অন্নদান, এতিম আত্মীয়কে অথবা ধুলি-ধূসরিত মিসকিনকে। ৩০ ঃ ৯০ ঃ ৪-১৩ ঃ আল কোরআন।

আল্লাহতায়ালা জীবনের উপকরণে তোমাদের এক শ্রেণীকে অপর শ্রেণীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। যাদের শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে, তারা নিজেদের জীবনের উপকরণ নিজেদের গোলামদের প্রতি ফিরিয়ে দিতে প্রস্তুত হয় না, যেন এই রিযিকের ক্ষেত্রে উভয়ই সমান সমান

www.pathagar.com

অংশীদার হতে পারে। তবে কি ওরা আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করে? –১৪ ঃ ১৬ ঃ ৭১ ঃ আল কোরআন।

তোমরা পূর্বদিকে না পশ্চিমদিকে মুখ করলে, তা কোন প্রকৃত পুণ্যের ব্যাপার নয় বরং প্রকৃত পূণ্যের কাজ হচ্ছে এই, মানুষ আল্লাহকে, পরকাল ও ফেরেস্তাকে এবং খোদার অবতীর্ণ কিতাব ও নবীদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সহকারে মান্য করবে আর আল্লাহর ভালবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজের প্রিয় ধন–সম্পদ আত্মীয়স্বজন, এতিম, মিসকিন, পথিক, সাহায্যপ্রার্থী ও ক্রীতদাসদের মুক্তির জন্য ব্যয় করবে। এছাড়া নামাজ কায়েম করবে ও যাকাত দেবে। প্রকৃত পুণ্যবান তারাই, যারা ওয়াদা করলে তা পূরণ করে, দারিদ্র, সংকীর্ণতা ও বিপদের সময় এবং হক বাতিলের দ্বন্দ্ব সংগ্রামে পরম ধৈর্য অবলম্বন করে। বস্তুত তারাই প্রকৃত সত্যপন্থী, তারাই মুত্তাকি। ২ ঃ ২ ঃ ১১৭ ঃ আল কোরআন।

তোমাদের বিধবাদের এবং সৎকর্মশীল দাস দাসীদের বিয়ে দিয়ে দাও। নহল ঃ ৭৫ ঃ আল কোরআন।

www.pathagar.com

তাদের কথা আছে
নবী (সঃ) এর জীবনাদর্শে

"হে লোক সকল! প্রত্যেক মুসলমান অপর একজন মুসলমানের ভাই। নিজের দাস-দাসী সম্পর্কে তোমরা খেয়াল রাখবে। তাদের তাই খেতে দাও, যা কিছু তোমরা আহার করবে, তোমরা যে ধরনের জামা-কাপড় পরিধান করবে, তেমন জামা কাপড় তাদেরও পরিধান করাবে"। **বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণ থেকে উদ্বৃত।**

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে দাসত্ব শৃংখল থেকে মুক্ত করবে, তার (আযাদকৃত দাসের) প্রতিটি অংগের বিনিময়ে আল্লাহ তার (মুক্তি দানকারী ব্যক্তির) প্রতিটি অংগকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। সাঈদ ইবনে মারজানা বলেছেন, আমি আলী ইবনে হোসাইন (ইমাম জয়নুল আবেদীন) এর কাছে গিয়ে হাদীসটি বর্ণনা করলে আলী ইবনে হুসাইন তাঁর এমন একটি ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দেয়ার সংকল্প করলেন, যাকে খরিদ করার জন্য আবদুল্লাহ ইবনে জাফর দশ হাজার দিরহাম অথবা এক হাজার দিনার দিতে প্রস্তুত ছিলেন। এরপর তিনি তাকে (দাসত্ব শৃংখল থেকে) মুক্ত করে দিলেন। -বুখারী শরীফ।

আবু মুসা (আশ'আরী) (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যার কাছে একজন দাসী আছে, সে যদি ঐ দাসীকে উত্তমরূপে ভরণপোষণ ও প্রতিপালন করে, তার প্রতি ঈমান এহসান করে, তাকে মুক্ত করে দেয় এবং পরে বিয়ে করে নেয়, তাহলে সেই ব্যক্তি দ্বিগুণ সওয়াবের অধিকারী হবে। -বুখারী শরীফ।

মা'রুর ইবনে সুয়াইদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আবু জার গিফারী (রাঃ) কে দেখলাম, তিনি একজোড়া কাপড় পরিধান করে আছেন এবং তাঁর দাসও অনুরূপ এক জোড়া কাপড় পরিধান করে আছে। এ বিষয়ে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, আমি এক ব্যক্তিকে (ক্রীতদাস) গালি দিয়েছিলাম। সে গিয়ে নবী (সঃ) এর কাছে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে নবী (সঃ) আমাকে বললেন, তুমি কি তার মায়ের কথা বলে তাকে গালি দিয়েছ? তার পর বললেন, তোমাদের ভাইয়েরাই তোমাদের খাদেম। আল্লাহ তাদের তোমাদেরই অধীনস্ত করে দিয়েছেন। সুতরাং তোমাদের কারও অধীনে তার ভাই থাকলে সে

www.pathagar.com

নিজে যা খাবে, তাই তাকে খাওয়াবে এবং নিজে যা পরিধান করবে তাই তাকে পরিধান করতে দেবে। আর তাদের ওপর সাধ্যের বাহিরে কোন কাজ চাপিয়ে দিও না। এতদসত্বেও কোন কষ্টকর কাজ দিলে সে ব্যাপারে তাদের সাহায্য কর। -বুখারী শরীফ।

আবু হুরাইরা (রাঃ) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন; নবী (সঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন দাস-দাসীকে এরূপও না বলে যে, আমার আবদ বা দাস এবং আমার দাসী বরং বলবে আমার বালক বা বালিকা কিংবা আমার ছেলেটি। -বুখারী শরীফ।

আবু হুরাইরা নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি [নবী (সঃ)] বলেছেন, তোমাদের কারও খাদেম তার কাছে খাবার নিয়ে আসলে সে যদি তাকে সাথে নাও বসায়, তাহলে অন্তত এক বা দু' লোকমা খাবার তাকে দেবে। কারণ, সে এই খাবার (পরিবেশন)-এর জন্য পরিশ্রম করেছে। -বুখারী শরীফ।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি রসুলুল্লাহ (সঃ) কে বলতে শুনেছেন, তোমরা প্রত্যেকেই শাসক এবং নিজের শাসিতদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব ইমাম বা নেতাও শাসক। তিনিও তার শাসিত বা অধীনস্তদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবেন। একজন লোক তার পরিবারের শাসক, সে তার অধীনস্ত বা শাসিতদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী তার স্বামীর বাড়ির শাসক বা রক্ষণাবেক্ষণকারী, সেও তার শাসিত বা অধীনস্তদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। খাদেম বা দাস-দাসী তার মালিকের অর্থ সম্পদের রক্ষক। সেও তার দায়িত্বে ন্যস্ত বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলেন, এসব কথা আমি নবী (সঃ) থেকে শুনেছি এবং আমার মনে হয় নবী (সঃ) (আরও) বলেছিলেন, ছেলে তার পিতার সম্পদের রক্ষক এবং তাকেও এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে। অতএব তোমরা সবাই রক্ষক ও শাসক। প্রত্যেকেই তার অধীনস্তদের বিষয়ে জবাবদিহি করতে হবে। -বুখারী শরীফ।

আবু হুরাইরা (রাঃ) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (সঃ) বলেছেন, তোমরা কেউ যখন লড়াই কর (যুদ্ধের ময়দানে কাফেরের মোকাবিলা কর) তখন চেহারায় আঘাত করা থেকে বিরত থাকবে। -বুখারী শরীফ।

[হাদীসটি যদিও যুদ্ধ সংক্রান্ত, কিন্তু এখানে উদ্বৃত করলাম এজন্য যে, যুদ্ধের ময়দানে ইসলামের দুশমন কাফেরের চেহারায় আঘাত করতে যখন নিষেধ করা হয়েছে, তখন অধীনস্ত চাকর চাকরানীদের চেহারায় আঘাত করা, ছেঁকা দেয়া, খন্তী গরম করে চামড়া পুড়িয়ে ফেলা, গরম পানি ঢালা, জিহবা কেটে ফেলার তো প্রশ্নই ওঠেনা, অথচ চাকর চাকরানীদের উপর তাই করা হয় যা কাফেরদের উপর প্রয়োগ করতে আল্লাহর রসুল (সঃ) নিষেধ করেছেন।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ আমি দীর্ঘ দশ বছর হুজুর (সঃ) এর খেদমত করেছি। তিনি কোন সময় (বিরক্ত হয়ে) 'উহ' শব্দটি পর্যন্ত বলেননি। আমি কোন একটা কাজ করেছি, (কিন্তু সে কাজ তাঁর মনঃপুত হয়নি) তার জন্য তিনি কোন সময় 'কেন করেছ' একথাটি পর্যন্ত বলেননি। আবার কোন সময় আমি কোন কাজ (যা করা উচিত ছিল) করিনি, তজ্জন্য তিনি আমকে 'কেন করনি' বলেননি। হযরত (সঃ) সৎস্বভাবে বিশ্বশ্রেষ্ঠ

www.pathagar.com

ছিলেন। রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর হাতের চেয়ে অধিক নম্র মোলায়েম ও মসৃণ কোন রেশমী বস্ত্রও আমি স্পর্শ করিনি এবং রসুলুল্লাহ (সঃ) –এর ঘর্ম থেকে অধিক সুঘ্রাণযুক্ত কোন কস্তরী বা আতরের আমি ঘ্রাণ নেইনি। (তিরমিযী)।

হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করিম (সঃ) এর সর্বশেষ বাণী ছিল নামায নামায এবং যারা তোমাদের অধীন তাদের ব্যাপারে খোদাকে ভয় কর (আল আদাবুল মুফরাদ)।

অর্থাৎ, নামায আদায়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং গোলাম ও চাকর চাকরানীদের সাথে ভাল ব্যবহার করা। তাদের প্রতি যুলুম অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি না করা।

রসূলে খোদা (সঃ) বলেছেন ঃ আল্লাহতায়ালা ঐ জাতিকে পবিত্র করেননা, যে জাতির সচ্ছল লোকজন তাদের চার পাশের দুর্বল দরিদ্র লোকজনকে ন্যায্য অধিকার দেয়না। –এন্তেখাবে হাদীস।

"ক্রীতদাস সমস্যা মানবেতিহাসের এক বড় সমস্যা। হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এ সমস্যার যে সমাধান করিয়া গিয়াছেন, তাহা একেবারে চূড়ান্ত। আব্রাহাম লিংকন এবং বুকার ওয়াশিংটন দাস ব্যবসা তুলিয়া দিয়াছেন বলিয়া আজ জগতের সর্বত্র প্রশংসিত হইতেছেন, কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করিঃ হযরত মোহাম্মদ (সঃ) ক্রীতদাসের সহিত যে ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন এবং তাহাদের সম্বন্ধে যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার এক কণাও কি পাশ্চাত্য জগৎ কার্য্যে পরিণত করিতে পারিয়াছে? দাস প্রথা তুলিয়া দেওয়াই বড় কথা নয়, বড় কথা হইতেছে দাসকে তুলিয়া দেওয়া, আব্রাহাম লিংকন অথবা বুকার ওয়াশিংটন কি কোন কাফ্রী ক্রীতদাসকে আপন পালিত পুত্র করিয়াছেন? আপন ফুফাত বোনের সহিত কোন হাবশী দাসকে বিবাহ দিয়াছেন? এক সঙ্গে খানাপিনা করিয়াছেন? নামাজ পড়িয়াছেন? তাহাকে কি কোন যুদ্ধের সেনাপতির পদে বরণ করিয়াছেন? অথবা কোন ক্রীতদাসীকে নিজে বিবাহ করিয়াছেন? যদি না করিয়া থাকেন, তবে বলিবঃ এত বড় সাড়ম্বরের মধ্যেও লুকাইয়া আছে একটা নিষ্ঠুর ছলনা ও ভন্ডামী। -----। ক্রীতদাস বেলাল, ক্রীতদাস জায়েদ এবং তদপুত্র ওসামা মুসলিম জগতের গৌরবমণি। এমন দৃষ্টান্ত আর কোথায় আছে? পরবর্তীকালে ক্রীতদাস কুতুবুদ্দীন ভারতের প্রথম মুসলমান সম্রাট হইতে পারিয়াছেন! এমন দৃষ্টান্ত বা কোথায়? ক্রীতদাসকে তুলিয়া আনিয়া সিপাহসালারের আর সম্রাটের সিংহাসনে বসাইয়া দেওয়ার দৃষ্টান্ত একমাত্র ইসলামেই আছে, অন্য কোথাও নেই।" [বিশ্ব নবীঃ গোলাম মোস্তফা ঃ পৃষ্ঠা ১৪২–১৪৪]

"হযরত খাদিজা তাঁহার পঞ্চদশবর্ষীয় ক্রীতদাস যায়েদ বিন হারিসকে উপঢৌকন স্বরূপ স্বামীর হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। হযরত তাহাকে দাসত্ব শৃংখল হইতে মুক্ত করিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিলেন; কিন্তু যায়েদ হযরতের অসাধারণ দয়া ও সৌজন্যে এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, পিতৃগৃহে গমন করিলেননা। সমস্ত জীবন তাঁহারই পবিত্র সঙ্গে অতিবাহিত করিলেন। হযরত তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন এবং কালক্রমে তাঁহাকে তাঁহার পিতৃব্য কন্যা পরমাসুন্দরী জয়নবের সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। [নবী শ্রেষ্ঠ–শাহাবুদ্দিন আহমদ জাহাগীর–নগরী, পৃষ্ঠা–৩৭]

www.pathagar.com

এই পুস্তক যাদের নিয়ে লেখা, তাদের পদবী বইয়ের ভাষায় 'গৃহ-পরিচারিকা ও গৃহ-পরিচারক', বড়লোকদের আটপৌরে ভাষায় যাদের নাম 'চাকর-চাকরানী', নবাবী আমলের অন্দর মহলীয় ভাষায় বা জমিদারী জমানার জমিদারী জবানে যাদের নাম 'বান্দাহ-বান্দী, দাস-দাসী', প্রাচীন আমলে যাদের পরিচিতি ছিল গোলাম, স্লেভ, ক্রীতদাস আর দাসী। আমি অবশ্য প্রাচীন কালের বা মধ্যযুগের এমনকি আধুনিক যুগের এই দশকের আগের গৃহপরিচারিকা বা পরিচারকের জীবন নিয়ে এ পুস্তকে আলোচনা করিনি, আলোচনা করেছি শুধু ১৯৯০ সাল থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের, বিশেষ করে রাজধানী ঢাকার মাত্র ৫৯ জন গৃহপরিচারিকা ও গৃহপরিচারক নিয়ে, যারা ক্রীতদাসের মত জীবন যাপন করেছে। কেউ কেউ পঙ্গু হয়েছে, নির্মম অত্যাচারের ক্ষত-চিহ্ন অঙ্গে বহন করে এখনও বেঁচে আছে, অত্যাচারের ধকল সামলাতে না পেরে তাদের অনেকে মারাও গেছে।

আল-হেরা প্রকাশনী